KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৪/- ৪/- ৪/- ৪/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৮৩ আষাঢ়, ১৩৮৩ শ্রাবণ ১৩৮৩ আশ্বিন, ১৩৮৩
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

CD. Roll No. : KLMLGK

Your Constructions are

CHEAPER — QUICKER

SAFER

with

It is made from Hard Drawn Steel Wire 37/42 Tons per sq. inch Tensile Strength complying in all respects with B. S. S. No. 785

It is electrically welded at all points of intersection.

It complies with B. S. S. 1221 Part 1945.

Managing Director : **Sri M. K. Bhimani.**

Calcutta Branch :
Alsales Ltd.,
30, Bentinck St.,
CALCUTTA.
Tele { Ph : 23-1070 / Gram : VAHLOVATAN

Sole Importers :
ALSALES LTD.,
9, Wallace Street,
Fort, BOMBAY.
Tele { Ph : 26-2130 / Gram : ALSALES / Fac. Ph : 86438

Madras Agents :
The Bombay Co. Ltd.,
P.O. Box No. 109,
169, Broadway.

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সম্পাদক ॥
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

চতুর্থ বর্ষ শ্রাবণ ১৩৬৩

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

চতুর্থ বর্ষ   শ্রাবণ   ১৩৬৩

প্রবন্ধ

বাংলার নব্য চিত্রকলা : নারায়ণ চৌধুরী ১৯৫
প্রমথ চৌধুরী : সবুজপত্র ও দেশকাল : রথীন্দ্রনাথ রায় ২০৯

কবিতা

অন্বিষ্ট : সরিৎ শর্মা ২০১
অন্য কোন নামে : অসীম সেনগুপ্ত ২০২
স্বপ্ন-জাগর : সন্তোষ চক্রবর্তী ২০৩
আর নীল নয় : বিভূতি ভট্টাচার্য ২০৪

উপন্যাস

এক ছিল কন্যা : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫
পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৯

গল্প

স্মরগরল : হীরেন বসু ২২৩

আলোচনা

সাহিত্যিকের রাজনীতি : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ২২৬

সমাজসমস্যা

সমাজে তরুণের স্থান : অচিন্ত্যেশ ঘোষ ২২৯

রেডিও-নাটক-সিনেমা

রেডিওয় 'চণ্ডালিকা'র হিন্দীরূপ : বাণী দত্ত ২৩১

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

আধুনিক কবির সম্মান ভাল : সিদ্ধার্থ সেন ২৩৩

গ্রন্থপরিচয়

সেই কন্যাকে (সুকুমার রায়)
কাল-মহুয়ার বন (বেণু দত্তরায়)
এক ফালি ঘাস (সুধীর সেন)
} হীরেন বসু ২৩৪
বৌদ্ধ দর্শন (রণজিৎকুমার সেন) : নারায়ণ চৌধুরী ২৩৫

ARUNA MILLS
MARINA
more DURABLE
more STYLISH
Specialities
SAREES
DHOTIES
SHIRTINGS
POPLINS
LONG CLOTH
VOILS Etc.
in Exquisite Patterns
★ A R U N A ★
ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD
★ A R U N A ★

সমকালীন
চতুর্থ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬৩

বাংলার নব্য চিত্রকলা

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলার নব্য চিত্রকলার ইতিহাসের তিনটি সুচিহ্নিত ক্রম আছে। আদি, মধ্য ও সাম্প্রতিক যুগ। আদি যুগ প্রায় গোটা উনিশ শতক জুড়ে বিস্তৃত, মধ্য যুগ উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর সাম্প্রতিক যুগের পরিচয় তার নামের মধ্যেই বিধৃত।

প্রত্যেকটি যুগের চিত্রকলারই একটা বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। প্রথম অধ্যায়ের চিত্রকলায় পাশ্চাত্য প্রভাবটাই ছিল সবচেয়ে বলবৎ। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারের ধারার প্রভাব চিত্রে প্রতিফলিত করার আগ্রহ ও চেষ্টা তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। আমাদের তদানীন্তন শিল্পীরা ইউরোপের রেনেসাঁ-যুগের শিল্পীদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলির অনুকরণে চিত্রাঙ্কনকেই তাঁদের শিল্পজীবনের সার বলে জেনেছিলেন এবং ওই-জাতীয় ছবির নিতান্ত ব্যর্থ অনুকৃতি এঁকে নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করতেন। এ যুগটা প্রধানত তৈল চিত্রের যুগ, প্রতিকৃতি অঙ্কনের যুগ। আমাদের পুরাতন জাতীয় ধারার চিত্রকলার সঙ্গে এ যুগকালের শিল্পীদের আদৌ যোগ ছিল না। সে বিষয়ে তাঁরা মাথা ঘামানোরও প্রয়োজন বোধ করেন নি। বস্তুতঃ ইতালীর নবজাগ্রত কালের চিত্রকলা, ওলন্দাজ চিত্রকলা এবং রসেটি, মরিস, ভেলাজকোয়েজ, টার্ণার প্রমুখ বিলিতি চিত্রকরদের আঁকা ছবির আদর্শ তাঁদের মনকে এমন গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, ভারতবর্ষের পুরাতন শিল্পকলার ঐতিহ্যের ভিতরও যে কিছু সম্পদ থাকতে পারে এ কথা একবারও তাঁদের মনে হয় নি। আমাদের অজন্তা, রাজপুত, কাঙড়া ও মুঘল চিত্রকলার মধ্যে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো বিভিন্ন কালের ভাস্কর্য, মন্দিরশিল্প আর স্থাপত্যের আদর্শের মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য আর সৌন্দর্য কিছু কম ছড়ানো নেই। কিন্তু মোহগ্রস্ত মানুষ যেমন রত্নখণ্ড ফেলে দিয়ে আঁচলে কাচ বাঁধে, তেমনি উনিশ শতকীয় বাঙালী শিল্পীরা জাতীয় চিত্রকলার সম্পদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বিদেশী চিত্রকলার দ্বারপ্রান্তে দাসবৎ নতজানু হয়ে বসেছিলেন।

পাশ্চাত্য চিত্রকলা তার স্ব-ক্ষেত্রে মহান্ সৌন্দর্যের আধার তাতে সন্দেহ নেই, তবে সৌন্দর্য বস্তুটি সার্বভৌম এবং সার্বকালিক আবেদনযুক্ত হলেও তারও দেশে দেশে রূপভেদ আছে। একের পক্ষে যা স্বাভাবিক তা-ই অপরের নিকট বর্জনীয় হতে পারে, হয়েও থাকে। আঞ্চলিক এবং কালগত

এই রূপভেদ যদি আমরা স্বীকার না করি তা হলে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কোন অর্থই থাকে না। জীবনের সকল স্তরে আর সকল বিভাগেই 'স্বধর্ম' 'পরধর্ম' বলে দুটি কথা আছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও কথা দুটি কম প্রযোজ্য নয়।

স্পষ্টতঃই ওই প্রথম অধ্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে স্বধর্মের বোধ জাগ্রত ছিল না। তাঁরা বিদেশী চিত্রকলার আদর্শের ভিতর শিল্পজীবনের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে স্বীয় অন্তর্স্বভাবকেই অস্বীকার করেছিলেন বলা চলে। এঁদের রচনার ভিতর কখনও-কখনও যদিও রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর বিষয়বস্তু চিত্রিত হয়েছে, তৎসত্ত্বে সে রূপকর্ম জাতীয়তা-মণ্ডিত হতে পারেনি এই কারণে যে, সেই সকল চিত্রের অঙ্কনরীতি পুরাপুরিই ছিল বিদেশী। বিজাতীয় আঙ্গিকের আশ্রয়ে রূপায়িত অতি বড় জাতীয় বিষয়বস্তুও বিকারদশা প্রাপ্ত হতে বাধ্য, তা সে রূপকার যত কুশলী শিল্পীই হোন না কেন।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে আমাদের শিল্পীদের এই আত্যন্তিক পরনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির মোড় ঘুরে গেল। এই কালে নূতন যে সকল শিল্পীর আবির্ভাব হল তাঁরা বিজাতীয়তার মোহ ত্যাগ করে পুরাতন ভারতীয় চিত্রকলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঞ্চয় থেকে অনুপ্রেরণা আহরণের চেষ্টা করলেন। নবচেতনায় উদ্দীপ্ত তাঁদের সাধনার লক্ষ্য হল স্বধর্মে স্থিত হওয়া, ভারতীয়-চিত্রকলার স্বভাবগত স্ফূর্তির উৎস সন্ধান ও আবিষ্কার করা। জাতীয় চৈতন্যের ভিতর তাঁরা ওই উৎসের সন্ধান পেলেন। এই সন্ধানকার্যে তখনকার কালের আবহাওয়া তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। তখন বাংলার আকাশে বাতাসে স্বদেশিকতার উদ্বোধনী মন্ত্রের ধ্বনিতরঙ্গ সদা সঞ্চরমাণ ছিল। দেশকে স্বাধীন করবার আগ্রহে জাতি একটা নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সেটি প্রাথমিক বিকাশের কাল। কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও তৎপ্রবর্তিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ছাপ এসে পড়েছিল দেশের সকল কর্মে, সকল বিভাগে। দেশের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য ওই সর্বব্যাপী প্রভাব-পরিধির বাইরে ছিল না। বৈদেশিক আধিপত্যের নাগপাশ ছিন্ন করবার চেষ্টা করতে গিয়ে বাঙালীর দৃষ্টি শুধু যে তার মাতৃভূমির বহিরঙ্গের উপরই পড়েছিল তা-ই নয়, জাতির প্রাচীন সম্পদের সম্ভাব্য সকল প্রকার আধার-স্থলগুলির উপরও তার মনোযোগ সমান ন্যস্ত হয়েছিল। ওই মনোযোগের ফলেই হারানো ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারের সাধনা আরম্ভ হয়, আর ওই চেষ্টার ভিতর নানা অনুকূল কার্যকারণের সমন্বয়ে চিত্রকলা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। আজকের দিনে আমরা যাকে প্রাচ্য রীতির চিত্রকলা বলি তার সূচনা এইভাবেই হয়।

শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ এই পুনর্জাগ্রত জাতীয় শিল্পধারার প্রধানতম প্রবক্তা তো বটেই, অদ্যাবধি প্রধানতম প্রকাশকও বটেন। তাঁর হাতেই এই রীতির বিকাশ এবং এই রীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নৈপুণ্য। অবনীন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী প্রথমে বৈদেশিক রীতি দিয়েই তাঁর শিল্পজীবন আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু এই শিল্পিশ্রেষ্ঠের সম্বিৎ ফিরে আসতে বিলম্ব হয় নি। অল্পকাল মধ্যেই তিনি তাঁর পায়ের তলায় মাটি খুজে পেয়েছিলেন—মাতৃভূমির পুণ্য মৃত্তিকা। সবচেয়ে আশ্চর্য, অবনীন্দ্রনাথের এই ভারত-আবিষ্কার-সাধনায় সর্বাধিক সহায়তা করেছিলেন যে কজন তাঁদের

প্রত্যেকেই বিদেশী—হাভেল, ওকাকুরা, সিস্টার নিবেদিতা প্রভৃতি। এই আশ্চর্য সংঘটনের একাধিক কারণ নির্ণয় হয়তো সম্ভব, তবে একটি প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিদেশীরাই বিদেশের অনুকরণ সবচেয়ে অপ্রীতির চোখে দেখে এবং ওই অশ্রদ্ধেয় প্রক্রিয়ার ভিতরকার ফাঁকিটুকু সহজে ধরতে পারে। ইংলণ্ড যে ভিন্নদেশবাসীর নিকট কখনও স্বদেশ হতে পারে না সে ইংরেজের চাইতে বেশী আর কে বুঝতে পারবে? যাই হোক, অবনীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বাংলার চিত্রকলা-আন্দোলনকে সম্পূর্ণ জাতীয় ভাব দ্বারা মণ্ডিত করলেন—এটি তাঁর শিল্পীজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। স্বদেশীয় সংস্কারের অনুশীলনেই যে আমাদের শিল্পীদের সর্বাধিক স্বভাবের স্ফূর্তি স্বীয়, শিল্পকর্মের মধ্যে তার কার্যকরী প্রমাণ উপস্থিত করে অবনীন্দ্রনাথ বাংলার শিল্পচেতনার সুনিশ্চিত অপঘাত-সম্ভাবনা রোধ করলেন।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র একটি নূতন শিল্প-আন্দোলনের প্রবর্তক মনে করলে ভুল করা হবে। একটু আগেই বলেছি যে, অবনীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র নব শিল্পরীতির একজন প্রবর্তকই নন, ওই শিল্পরীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশকও বটে। আমাদের বাংলা চিত্রকলায় এত বড় কবিপ্রাণ শিল্পীর আর আবির্ভাব হয় নি। আমার মনে হয় শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের ভূমিকাকে বাংলা দেশ কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব করে দেখেছে। এতে এই মহান শিল্পনায়কের ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, বলাই বাহুল্য। একজন শিল্পী নূতন শিল্প-আন্দোলনের প্রবর্তনার সূত্রে কী পরিমাণ কর্মদক্ষতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন সেটি ইতিহাসের বিষয়, ইতিহাসেই তার স্থান হওয়া উচিত; ওই তৎপরতার সঙ্গে বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের বিশেষ সম্পর্ক নেই। অবনীন্দ্রনাথ যেখানে একটি নূতন আন্দোলনের জন্মদাতা, সেখানে তিনি নেতা, চালক, সংগঠক, কর্মী। কিন্তু যেখানে তিনি শিল্পী সেখানে তাঁর আর-সব পরিচয় বাহ্য; বিশুদ্ধ শিল্পী হিসাবেই তখন তাঁকে আমাদের বিচার করতে হবে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্র অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার তুলনা হয় না। তাঁর নেতৃ-পরিচয়কে বহুদূর ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পী-পরিচয়। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এক অ-দেখা জগতের অস্পষ্ট আভাস রূপকথার রহস্যে আর কুয়াসায় মিশে আমাদের স্বপ্ন-সত্তাকে বারেবারেই আলোড়িত করতে থাকে। এ স্বাদ আর কার ছবিতে পাব। এমন সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতিই বা আর কোন্ ছবিতে মিলবে।

শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ এক সুবিশাল ও সুসমৃদ্ধ শিল্পপরম্পরার স্রষ্টা। শিষ্য, অনুশিষ্য আর প্রশিষ্যে মিলে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব বহুব্যাপ্ত। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সুরেন্দ্রনাথ কর, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনলিনী দেবী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, সুধীর খাস্তগীর, রামকিঙ্কর বৈজ, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রখ্যাতনামা শিল্পীদের সে এক বিরাট মিছিল। এর ভিতর শিল্পাচার্য নন্দলালের নাম নানা কারণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। চিত্রকলায় গ্রামীণ ভারতের তিনি শ্রেষ্ঠ রূপকার। গ্রামজীবনের স্বপ্নসুন্দর শ্রীমণ্ডিত রূপটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অগণিত রেখা ও বর্ণচিত্রে।

চিত্রের ভাবময় রূপ এবং আঙ্গিকগত রূপ উভয় ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। বিভিন্ন পদ্ধতির অঙ্কনশৈলীর উপর তাঁর দখল অসামান্য। তাঁর রেখাসকল নির্ভুল এবং বলিষ্ঠ। তবে সব জড়িয়ে নন্দলালের চিত্রকর্মকে বিচার করতে গেলে বলতেই হয় যে তিনি মূলতঃ শান্ত রসের সাধক। কাব্যের গভীর ব্যঞ্জনা কিংবা আঘাত-সংঘাতময় জীবনের আলোড়ন অপেক্ষা তাঁর ছবিতে যেন প্রজ্ঞা-সুন্দর প্রশান্তির ভাবটিই বেশী বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। নন্দলালের শিল্পীমন শান্ত স্থির কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সুরে বাঁধা ; এ মনের ভিতর আধুনিক কালোচিত হতাশা আর জিজ্ঞাসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিক্ষেপের আলোড়ন এতটুকু দাগ কাটতে পারে নি। সাম্প্রতিক শিল্পকলার জটিল তথা নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্ব থেকে নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে রেখে নন্দলাল যেমন আধুনিক রীতির শিল্পকলার প্রতি তাঁর চিত্তের বিমুখতা প্রকাশ করেছেন, তেমনি ওই প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বীয় চিত্তের শান্তিকেও সুরক্ষিত করেছেন। চিত্রকলার এক অক্লান্ত সাধক আচার্য নন্দলাল, জীবনভোর তিনি ছবি এঁকেছেন এবং এখনও অবিরাম ধারায় ছবি এঁকে চলেছেন ; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ওই আত্যন্তিক কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর উচ্চ ভাবলোকে অবস্থিত শিল্পীমনের প্রশান্ত বৈরাগ্য অমলিন রেখেছেন। নন্দলালের অনাসক্তি বিস্ময়কর।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নামপঙ্ক্তির অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারেন। যদিও তিনি মুখ্যতঃ অবনীন্দ্র-নন্দলালের ধারাবাহী শিল্পী, তা হলেও তাঁর চিত্রকলায় পাশ্চাত্য প্রভাবও কিছু কম লক্ষ্যগোচর নয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য কলারীতির ভিতর তিনি এক সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর ছবিতে। ললিত এবং রুদ্র দুইই তাঁর হাতে খোলে ভাল। আর তাঁর ভাস্কর্য তো একান্তভাবেই ইউরোপীয় ভাস্কর্যের পৃথুলতা ও বলিষ্ঠতার স্মারক। মনে হয় দেবীপ্রসাদ ছাড়া প্রাচ্য কলারীতির অনুশীলনকারীদের মধ্যে আর একজন মাত্র শিল্পীর ছবিতে ও ভাস্কর্যের নমুনায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সুসমঞ্জস সমন্বয় ঘটেছে—তিনি রামকিঙ্কর। আধুনিক পদ্ধতির চিত্রকলার ছাপ রামকিঙ্করের শিল্পকর্মের উপর তার সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রাচ্য কলারীতির সাধকদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে নিবিড় শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেও বলা যায় আমাদের আধুনিক চিত্রকলার আন্দোলনের ইতিহাসে এমন একটা সময় এল যখন শিল্পচেতনাকে নূতন পথে চালিত করবার প্রয়োজনবোধ ও আকূতি আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। শিল্পরূপ যত মহানই হোক, একই শিল্পরূপের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি চললে তাতে একঘেয়েমি দোষ বর্তাতে বাধ্য। প্রাচ্য কলারীতির শিল্পসাধনাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করবার কারণ নেই। তাছাড়া নতুন কালের প্রয়োজনে নতুন শিল্পরূপ দেখা দেবেই, পুরাতন অনির্দিষ্ট কালের জন্য জায়গা জুড়ে থাকতে পারে না। নূতনের ভালমন্দ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ সব সময়ই থাকবে, সেই বিতর্কের ভিতর প্রবেশ না করেও বলা যেতে পারে যে, রুচির পরিবর্তনে চাহিদারও পরিবর্তন আর ওই চাহিদার অনুসার ও অনুপাতেই শিল্পরূপের বিবর্তন নিষ্পন্ন হয়। আধুনিক পদ্ধতির চিত্রকলার ভিতর বিশুদ্ধ শান্তরস আর কৃষিকেন্দ্রিক সারল্যের

ছাপ যদি নাই থেকে থাকে, বুঝতে হবে সাম্প্রতিক কালের অবস্থায় ও ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে এবং তদনুযায়ী শিল্পরূপেরও বদলে ঘটেছে। একটা জিনিস তো অতি প্রত্যক্ষ যে, নাগরিকতা তথা আধুনিক জটিল মনন হালের শিল্পকলার উপর ক্রমশঃই অধিক প্রভাব বিস্তার করছে। সু ও কু, আলো ও অন্ধকার, সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান চেতনা, পাপ ও পুণ্যের বোধ মিলিয়ে যে মিশ্র মনন লীলা, সেই মননেরই সর্ব্বাধিক ছাপ পড়ছে এসে সমকালীন চিত্রকলার উপর। শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতার হতাশা আর দ্বিধা, প্রত্যয়হীনতা আর ভোগলিপ্সা, অভাব-অনটন আর রোগজর্জরতা, অপরাধবোধ, বিষাদ আর বিমর্ষতা—একে একে সব কটি লক্ষণই হালফিল চিত্রকলার উপর তাদের কালো ছায়া বিছিয়ে দিচ্ছে। শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে তাঁদের দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করে হয় তাকে মনের গভীরে চালিয়ে দিচ্ছেন নয়তো নগর জীবনের নিতান্ত বাস্তব পরিবেশের উপর তাকে সংবদ্ধ করছেন। নিসর্গচিত্র (landscape) অপেক্ষা সমাজ বাস্তবতামণ্ডিত 'রিয়ালিষ্টিক' চিত্র কিংবা সুর-রিয়ালিষ্টধর্মী মনোমুখী চিত্র অঙ্কনের দিকেই সাম্প্রতিক শিল্পীদের সমধিক ঝোঁক। গ্রামীণ জীবনের সারল্য, সহজতা তথা শান্ত রস নগরের প্রান্তসীমায় এতটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে না, সুতরাং আধুনিক নাগরিক চিত্রকলায়ও তাদের ছাপ অনুপস্থিত। আদর্শ সারল্য আর প্রশান্তি খোদ গ্রামেই আজকাল দুর্লভ, শহর তো দূরস্থান। সুতরাং স্বভাবতঃই আচার্য নন্দলালের আদর্শবাদকে সশ্রদ্ধ চিত্তে বিদায় জানিয়ে সাম্প্রতিক শিল্পীরা আধুনিক কালোচিত জটিল মননের রূপায়ণের দিকে বেশী ঝুঁকেছেন। শক্তিভেদে এ চেষ্টার সাফল্য ও ব্যর্থতা, তবে এ চেষ্টার অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা যায় না।

কলকাতায় সাম্প্রতিক শিল্পকলার প্রবক্তাদের একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে। এঁদের সকলেই তাঁদের সাধনার মধ্য দিয়ে সমকালীন জীবনকে রূপ দেবার চেষ্টা করছেন—চেষ্টার ফলাফল বলাই বাহুল্য তাঁদের শক্তির তারতম্যের মানদণ্ডে বিচার্য। এক সময়ে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' এইরূপ এক চেষ্টার সংহতিস্থল ছিল, এখন তদন্তর্গত শিল্পীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিশে গেছেন। আধুনিক শিল্পের প্রবক্তাদের মধ্যে এই সব শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর বৈজ, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল, রথীন মৈত্র, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মিত্র, শুভো ঠাকুর, সুনীল পাল, মাখন দত্তগুপ্ত, আমিনা আহমেদ, জয়নুল আবেদন, গোবর্ধন আশ, গোপেন রায়, কিশোরী রায়, রণেন আয়ান দত্ত, শৈলেন মিত্র, দেবনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আমরা এতাবৎ শ্রীযামিনী রায়ের নাম করি নি। ইচ্ছা করেই করি নি। যামিনী রায় আধুনিক বাংলার শিল্পকলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর এক ব্যক্তিত্ব—একক এবং অদ্বিতীয়। তিনি একাই একটি শ্রেণী। তাঁর ধারার পূর্বসাধকও কেউ নেই, সম্ভবতঃ উত্তরসাধকও কেউ থাকবে না। পাশ্চাত্য চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ অঙ্কনরীতি, বিশেষ করে তৈলচিত্র আর প্রতিকৃতি চিত্রের আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করে সেই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত হেলায় ত্যাগ করে তারপর বিগত বাংলার পটশিল্পের পুনরুজ্জীবন চেষ্টায় সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগের

দৃষ্টান্ত একমাত্র যামিনী রায়ের মত আদর্শনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা শিল্পীতেই সম্ভব। লুপ্তপ্রায় কালীঘাটের পটশিল্পের পুনরুজ্জীবন আর ঐকান্তিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যামিনী রায় কতটা কী পেলেন আর কতটা হারালেন তার বিচারের সময় এখনও হয় নি। ভবিষ্যৎ একদিন এ প্রয়াসের যথার্থ মূল্য পরিমাপে অগ্রসর হবে। তবে এক বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, যামিনী রায় সাম্প্রতিক বাংলার সর্বাধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পী। ত্যাগ ও দৃঢ়চিত্ততার তিনি এক মুখ্য দৃষ্টান্তস্থল। যামিনী রায়ের শিল্পী-সত্তার এই দিকটির হিসাব না নিলে তাঁর প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে।

অন্বিষ্ট

সন্বিৎ শর্মা

রাত্রির সমুদ্রে কোনো, নিরন্তর কুয়াশার ঘুমের ভিতরে,
বন্দরের আলো-খোঁজা জাহাজের কী নিঃসংগ নাবিকের মতো,
জীবনের সে-ই কথা খুঁজে মরি···সময়ের পুরোনো বন্দরে,
স্মৃতির ধূসর দ্বীপে, খুঁজে খুঁজে পাইনি যা—খুঁজেছি তো কতো!

হীরের মতোন করে অনেক কাঁচের কুচি সঞ্চয়ের ঝাঁপি
ভরে দিল এ-সন্ধানে—মেলেনি কোথাও কথা (আলোময় হীরে!) ;
কতো সময়ের জল পার হয়ে এখনো আশায় তবু কাঁপি,
নোতুন বন্দরে দ্বীপে যদি মেলে সেই আলো কুয়াশার ভিড়ে!

দু-হাতে গানের কলি, কবিতা-গল্পের শিখা সর্বত্র জ্বালিয়ে
যেতে যেতে একদিন হয়তো বন্দরে কিম্বা নির্জন সাগরে
কোনো, থেমে গেলে, নিভে যাবে তারা (কতো গেছে!); জাহাজ চালিয়ে
চালিয়ে আসবে ফের অগণ্য নাবিক সেই কথা খোঁজ করে!

পাবো কি! তবুও যদি কোনোদিন কেউ বলে এ-জাহাজ দেখে :
'জীবনের শেষ কথা এ-বন্দরে মাস্তুলে কে গেছে জ্বেলে রেখে!'

অন্য কোন নামে

অসীম সেনগুপ্ত

তোমায় ডেকে আর এক নামে আজকে এই রাতে
বলোনা, কেন হারিয়ে যাই এমন নিরালাতে
বলোনা, ওগো বলোনা আজ মনের কথা কেন
তোমায় ভেবে লাজুক হ'ল :
(ভোরের রোদ যেন ॥)

ভোরের রোদ অবোধ বুঝি ; ফুরানো গান হ'য়ে
আমার প্রাণে গভীর হ'ল। আমি তো ভয়ে ভয়ে
তোমায় আজ গেলাম ডেকে নতুন কোন ছলে
কথার ঠোঁটে মুখটি রেখে, লজ্জা পাবো বলে।

না হয় পাবো ;—তবুতো দেখি আমার ভাঁঙা কাঁচে
তোমার দিন রঙিন এক ফলক হয়ে নাচে।

প্রেম যে ছিল একথা যদি স্মরণে রেখে থাকো
আজকে তবে মাটির ঘ্রাণ দুহাত দিয়ে মাখো
আকাশে আজ ছড়িয়ে দিয়ে গানের রেশ কারো
খুশির ঢেউয়ে একটি ডুব দিতেও তুমি পারো।

তোমার হাতে মরণ আছে প্রাণের কলরবে
তাইতো আজ তোমায় ডাকি আমার সম্ভবে ॥···

এখন তুমি গাও না গান, মাতাল সুরে সুরে
যে গানে আমি হারাতে পারি অনেক দূরে দূরে ;
যে গান পারে আমায় দিতে অলস আকুলতা
সবুজ ঘাসে দিনের মত, একটি নীরবতা।

তোমায় ডেকে আর এক নামে তোমারই গড়া রাতে
হারানো মোর হবে না শেষ এমন নিরালাতে।

স্বপ্ন-জাগর

সন্তোষ চক্রবর্তী

একটি জোনাকী বারে বারে ফিরে আসে
নীল আলোকের ইংগিতে পথ চেয়ে
নিটোল আবেশ : কেতকীপাতায় ঘাসে
স্মরণের লিপি এঁকেছে মদির মেয়ে।

রাতের অকূলে পৃথিবীতে একা আমি
জেগে আছি ঢের : দু'চোখে আগুন-ঝরা
শিহর চেতনা ভীরু আলো-অনুগামী—
দপ্‌দপ্‌ জ্বলে ; জোনাকী স্বয়ংবরা।

একটি জোনাকী আজো ফিরে ফিরে আসে
নীল রজনীর ইংগিতে গান গেয়ে
মনে এনে দেয় একটি দীর্ঘশ্বাসে
সঘন চেতনা : মমতায় গড়া মেয়ে ॥

আর নীল নয়

বিভূতি ভট্টাচার্য

আর নীল নয়,
সমুদ্রের সব স্বাদ লোনা মনে হয় ;
আকাশেও বার বার মেলে দিয়ে ডানা
ক্লান্ত আমি ; ঘুরে ঘুরে তোমার ঠিকানা
পেলাম এখানে, এই বিদেশ বিভূঁয়ে ;
আলগোছে তোমাকেই ছুঁয়ে
তৃষ্ণা-তৃপ্ত বেদুইন মন,
সাঙ্গ তার পৃথিবী ভ্রমণ।
তারপর এই রাত-শেষে,
সাগরিকা মেয়ে আর
মাটীর ছেলেটি হেসে হেসে
কথা বলে যেখানে দুজনে,
ঢেউ তোলে বালুচরে অধীর কূজনে,
দখিন হাওয়ার মাঝে
পাশাপাশি হাঁটে,
চলে যাব সেই দ্বীপে
সবুজাভ মাঠে ;
ঝিলিমিলি আলো-কাঁপা
গাছের ছায়ায়,
নীড় বেঁধে নেব দুজনায়।
জীবনের সব স্বপ্ন সাধ,
সুনিবিড় প্রেমের আস্বাদ,
এঁকে দেবে দুটি ঠোঁটে তুমি,
ফোটাবে মরুর মনে
ফুল-মৌসুমী।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়ছিলাম সেদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী। শাহাজাদা সেলিমের খামখেয়ালের কথা বেশী কিছু নেই। সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অগণিত ঐশ্বর্যের আর যুদ্ধের কথা। এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম। চুপ করে বসে ভাবছিলাম।

একবার সম্রাট জাহাঙ্গীর এক ফকিরের কাছে গিয়েছিলেন। সেই ফকিরের আশ্চর্য শক্তিতে আকাশ থেকে মোহরের বৃষ্টি হোত। জাহাঙ্গীর তাঁকে সম্মান করে হাজার সেলাম জানিয়ে চলে এলেন। শুনলেন এক অর্বাচীন যুবক ফকিরের ওপর তাঁর ভক্তি দেখে ঠাট্টা করেছে। জ্বলে উঠলেন জাহাঙ্গীর। হুকুম দিলেন, যে মুখে সে ফকিরের নিন্দা করেছে, সম্রাটের নিন্দা করেছে, সেই মুখের চামড়া ছাড়িয়ে তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে সহরে ঘুরিয়ে আনা হোক।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। চুপ করে বসে ভাবছিলাম পড়তে পড়তে। এই সাহসী সত্যবাদী যুবকটির কাহিনী আজ আর জানবার উপায় নেই। সেদিনের কোনো সাহিত্যিক কেন এই যুবকটির কথা ভাবেনি, তার কাহিনী লিখে যায় নি ? বোধ হয় উপায় ছিল না। সাহিত্যিক, চারণ-কবিদেরও জাঁহাপনার গুণগান করতে হোত। সাধারণ মানুষের কাহিনী বড়ই তুচ্ছ, বড়ই একঘেয়ে। জাঁকজমকে জমকালো হয় না। পড়তে লিখতে স্নায়ুতে উত্তেজনার শিহরণ আসে না। কি হবে ওদের কথা লিখে।

ভাবছি লিখব কি না। এক অতি সাধারণ মেয়ে মৃগনয়নীর কাহিনী দেখেও তার কথা লিখব কিনা ভাবছি বসে বসে।

এমন করুণ এত মধুর এমন বিষাক্ত এত অমৃত ভাবাবেশের কাহিনী শোনালে ভাল লাগতেও পারে কারো কারো। তাছাড়া মৃগনয়নীর কথাটাও বারে বারেই মনের তলায় শুনছি, ও বলেছিলো—তুমি তো লেখো ? আমার কথা একটু লিখো।

চুপ করে থাকতাম। ওর করুণ চোখ দুটো দেখে বলতাম, হবে হবে।

ভাবি বসে বসে কিই বা লিখব।

ও যদি রাণী বা শাহাজাদী হোত, জমত।

ডাইনী শাঁকচুন্নী হলেও ভুতুড়ে কিছু একটা করে পাঠকের চোখ বিস্ফারিত করে দেয়া যেত। কিন্তু নেহাতই সাধারণ এক মেয়ে।

বলতে গেলে বলতে হয়—এক যে ছিল কন্যা, নাম তার মৃগনয়নী।

এক স্বনামধন্য জমিদার বংশের ভালো মানুষ রামতারণ ওর বাবা। দু-ভাই দু-বোন। জ্যাঠামশাই, যাঁকে ওরা বলত কর্তাবাবা, তিনিই জমিদারী দেখতেন।

বিশাল জমিদারী বিরাট পরিবারের এক ঘরের কোণে মানুষ হয়ে উঠেছিলো মৃগনয়নী। খুব ছোট বয়েসের কথা ওর আবছা আবছা মনে আছে।

মানে ছ সাতমাসের কথা।

ঠিক মনে থাকা নয়। অস্পষ্ট আলোর ছবি ভাসে মনের ওপর।

বেশ মনে পড়ে তখন কোনো আলো দেখলেই মনটা ভরে উঠত কৌতুকে।

ছোট ছোট নরম হাত পা ছুঁড়ে খেলতো প্রদীপের পলতের আলোর দিকে তাকিয়ে।

আলোটা নিভু নিভু হয়ে এলে পাশে বসে উস্‌কে দিত তরঙ্গিনী।

তরঙ্গিনী ওর দিদি। বছর পাঁচেক বয়েস তখন।

কখনো কখনো তরঙ্গিনী ওর ফুলো ফুলো গাল দুটো টিপে দিত সজোরে।

তবুও কিনা কাঁদত না মৃগনয়নী।

মা বলতো মেয়েটা যেন এক রাশ ভিজে তুলো।

যেমন নরম তেমনি নীরব।

মুখের ভেতর চোখদুটো বড্ড বেশী ডাগর। আর চাউনীটা ট্যালা-ট্যালা।

হাবা-টাবা হবে নাকি?

কে জানে! মাঝে মাঝে পিসী খুড়ীদের মুখে শোনা যেত।

মেয়ে বলতে তরঙ্গিনী। যেমন চটপটে, তেমনি চতুর। কথায় কাজে পাখোয়াজ।

দুধে ধোয়া গায়ের রঙ। কাঁচপোকার টিপ। ছোট একখানি লাল টুকটুকে শাড়ী পরে ঠোঁটে আলতা মেখে ঘুরে বেড়াত।

মা ঘাটে যাবার আগে হয়তো বলে গেল—মেয়েটাকে দেখিস।

তরঙ্গিনী কিছুক্ষণ হয়ত তালি দিত, ছোট রাঙা শাড়ীর আঁচলটা গুঁজে দিত মুখে। রাঙা শাড়ীর আঁচল নিয়ে খেলা করতো মৃগনয়নী।

তরঙ্গিনী উলটো দুপাক ঘুরে কাপড়ের পাক খুলে সটান চলে যেত ছোটতরফের পাঁচালের পাশে কামরাঙা গাছের তলায়। এসে দেখে ততক্ষণে পুঁটি আর সরমা এসে জুটেছে। পুঁটির গালে একটা চিমটি কাটে তরঙ্গিনী।

রোগা নিরীহ পুঁটি চোখ পিটপিট করে ওর হাতে দুটো কামরাঙা দেয়—নে খা। বড্ড কাঁচা ভাই।

পুঁটি মেজ জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে।

তরঙ্গিনী কামরাঙা দুটো একবার কামড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

মুখটা বেঁকিয়ে বলে, ত্তর ত্তর কাঁচা!

তারপর পুঁটিকে ডাকে—চ' বেতুল খাবি।

বেতুল মানে বেতফল। বেতের কাঁটা ঝোপে ঢুকে ছোট ছোট ফলগুলো তুলতে হবে পুঁটিকেই। ঝোপের বাইরে থেকে ধমকাবে তরঙ্গিনী।

মৃগনয়নী একা একা শুয়ে থাকে। বড় বড় চোখে আলোর ঝলক নেচে ওঠে। সকালের নরম সূর্যের আলো। সর্বাংগে আলো মেখে পড়ে থাকে আর অকারণেই হাসে।

অবুঝ আনন্দে মন ভরা। বোঝবার বোঝার মন তার নয়। শুধু খুসী। শুধু শুধু।

জীবনের এমন সময়টা চিরদিন কেন থাকে না!

বিশেষ কিছু মনে নেই, মনে আছে শুধু মায়ের পরম আরামের গরমটুকু। আর তাকিয়ে তাকিয়ে আলোর সন্ধান।

কাঁদতে জানত না মৃগনয়নী।

জীবনের ভোরেও নয় ম্লান সন্ধ্যায়ও নয়।

তবু যদি বা এক আধ সময় একটু কাঁদবার চেষ্টা করে কোঁকাত। ওকে কোলে তুলে নিত একজন। সে হৃদয়দা।

হৃদয় বারিক।

হৃদয় বারিকের ইতিকথা পরে শুনেছিল মৃগনয়নী। বিস্ময়ে ভয়ে বড় বড় চোখ দুটো ওর বিস্ফারিত হয়েছিল আরও।

মধুগঞ্জের রাজার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের একটা চর নিয়ে দাঙ্গা হয়।

মৃগনয়নীর জ্যাঠামশাই কর্তাবাবু ছিলেন বজরায়। মাঝ নদীতে নোঙর করেছিলেন।

খান পাঁচেক ছিপ নৌকো। কালো সাপের মত সরু লম্বা। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চরে গিয়ে ঠেকল।

রামদা আর বর্শা নিয়ে নেমে পড়ল ময়রাবাড়ীর কুখ্যাত ডাকাত প্রজার দল। প্রায় তিরিশ জন।

চরের ওপর থেকে কাশবনের পেছন থেকে বিকট আওয়াজ এলো মধুগঞ্জের দাঙ্গাবাজদের! এরাও প্রত্যুত্তর দিলি

তিনটে বর্শা চোখের পলকে এসে বিঁধল। একটা মানুষের বুকে আর দুটো বালির ঢিপির ওপর।

দাঙ্গা হোল।

ওদের জখম হোল তিনটে। মরল গোটা ছয়েক।

গরু দুটোকে ভাসিয়ে দেওয়া হল ব্রহ্মপুত্রের জলে।

জখম তিনটেকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে এলো কর্তাবাবুর বজরায়।

—তিনটে জখম হুজুর।

জখম ছেড়ে দিলে মোকদ্দমায় জেতা যাবে না। নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কোন মামলা যাতে না হয়।

হুকুম দিলেন কর্তাবাবু—টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দাও।

রামদা হাতে জন আষ্টেক কুঁচো কুঁচো কেটে ভাসিয়ে দিল দুটোকে।

আর একটা। অল্প বয়েস। বছর ষোল বয়েস। বড় বুকের ছাতি, যোয়ান।

হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলা হোল।

রামদায়ের কোপে নদীতে ছিটকে পড়ল পায়ের আঙুল দশটা।

ছেলেটা আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগল—রাজাবাবুর কাছে যাব। রাজাবাবু।

কি খেয়াল হোল কর্তাবাবু হাত পায়ের আঙুলকাটা ছোঁড়াটার কাছে এগিয়ে এলেন।

—আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আমাকে মারবেন না রাজাবাবু।

কর্তাবাবু তাকাল ছেলেটার দিকে। রক্তাক্ত হাত পা।

এখুনি রামদায়ের আর একটা কোপে দুখানা হয়ে যাবে ছেলেটা।

বললেন,—ছেড়ে দে ওকে।

ছেলেটা চলে এলো কর্তাবাবুর সঙ্গে তাঁর গোলাম হয়ে।

আজও সে গোলাম হয়ে আছে।

হাত পায়ের কুড়িটা আঙুল নেই।

হৃদয় বারিক।

হৃদয় বারিক তার কথা রেখেছে। কর্তাবাবুর হুকুম তার কাছে স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। যা বলেন তাই।

কর্তাবাবুও ভালবেসেছেন ওকে। ধীরে ধীরে। ছেলেটা বড় ভাল। হৃদয় আছে হৃদয়ের।

মৃগনয়নীকে বড় ভালবাসত হৃদয়দা।

একটু কাঁদবার চেষ্টা করতে না করতে আঙুলবিহীন হাতদুটো জড়িয়ে কোলে নিত ওকে।

নিজের থাকবার ছোট ঘরটিতে নিয়ে আসত। ঘুম পাড়াত।

নিজের বিছানার ওপর ওকে শুইয়ে রেখে খুসী খুসী মনে কাগজের মোড়ক থেকে বার করত গাঁজা। ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি আর সরু কলকে। হৃদয় গাঁজা খেত, আর খেত লঙ্কা। এক থালা ভাত সঙ্গে গোটা ছয়েক লঙ্কা পোড়া।

লঙ্কাপোড়া না পেলে মেজাজটা ওর বিগড়োত মাঝে মাঝে।

—কি যে করো ঠাকরুণ! লঙ্কা না পেলে গায়ের ব্যথা মরবে কিসে শুনি।

রাঁধুনীকে দিত দুটো ধমক।

সঙ্গে সঙ্গে কর্তামা নিজে ওর পাতে ছুঁড়ে দিতেন গোটাকতক লঙ্কা।

হৃদয় ঠাণ্ডা। একেবারে জল।

খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরটিতে গিয়ে একটু জিরোত হৃদয়। বেলা গড়িয়ে না এলে ওকে ওঠাবার উপায় নেই।

বিকেলে হয়ত বললেন—ওরে, কাঠ কিন্তু মোটে নেই। মালি আসেনি আজ।

আঙুল কাটা হাতে কুড়ুলটা বাগিয়ে ধরতো হৃদয়। বৃথা কথা না বলে একখানা মোটা ডাল চেলা করে দিত ঘণ্টা দেড়েকে। বুক পিঠ ভিজে যেত ঘামে।

কর্তামা ভারী খুসী, হৃদয় না হলে কি চলে?

(ক্রমশঃ)

প্রমথ চৌধুরী ঃ সবুজপত্র ও দেশকাল

রথীন্দ্রনাথ রায়

যেকালে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ক'রে নূতন গদ্যরীতি প্রবর্তন করেন, সেকালটিকে আর যাই বলা যাক না কেন প্রবন্ধ সাহিত্যের শৈশব যুগ বলা যায় না। কারণ তার অব্যবহিতপূর্ব শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারেরা জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পার্শ্বসহচর মনীষী লেখকদের হাতে বাংলা গদ্যের বলিষ্ঠতা, প্রসাদগুণ ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর সমকালীনদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের মত প্রবন্ধকারও ছিলেন, তথাপি প্রমথ চৌধুরীর নিঃসঙ্গ একাকীত্ব বাংলা গদ্যের ঐতিহ্যের দিক থেকে একটু আকস্মিক বলে মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যে সহজ সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, প্রমথ চৌধুরীর রচনা যেন সেই সহজাত সংস্কারকে প্রবলভাবে আঘাত করে। বাংলা সাহিত্যের যে একটি দীর্ঘ-প্রসারী ঐতিহ্য আছে, তিনি শুধু তার ব্যতিক্রমই নন, বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়াও। বাংলা সাহিত্যের কৌলিক পরিচয় বিচার করলেই এ বিষয় সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাবাতিরেক ও আবেগাতিশয্যের পরিচয় আছে। ভক্তিরস-মন্থর সংস্কারাচ্ছন্ন মনের স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত গতিশক্তি যেন স্তিমিতপ্রায়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্য—এই ত্রিধারাই যে বিশেষ রসস্রোতে আন্দোলিত হয়েছে, সে রস আর যাই হোক আবেগবিরল পরিমার্জিত বুদ্ধিধর্ম সেখান থেকে নির্বাসিত। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য অনেকখানি যুক্তিতর্কের বাহন হ'য়ে উঠেছিল। বাংলা গদ্যের এই নৈয়ায়িক মেজাজের যুগেও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক পিতৃপুরুষের সন্ধান মেলেনি। কারণ, যুক্তিতর্ক এলেও আবেগের বন্যা রোধ করার মতো ক্ষমতা তার হয়নি। তাই কারণে অকারণে বাষ্পোচ্ছ্বাস ও আতিশয্য-প্রবণতা তখনকার গদ্যের একটি সাধারণ ধর্ম ছিল। ঐ যুগের প্রবন্ধকারদের রচনায় গবেষণা-ধর্ম ছিল প্রধান, পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বক্তব্যটিই ছিল প্রধান, সে যেমন ভাবেই হোক না কেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের উপাদান ও বস্তুগুণের তুলনা নেই, কিন্তু সে তুলনায় বলার মাধ্যমটি দুর্বল। সে যুগের লেখক কি বিষয় লিখবেন, তার সাধনাই করেছেন, কেমনভাবে লিখবেন, তার দিকে তাঁদের তেমন নজর পড়েনি। গৌতম বুদ্ধের জাতিনির্ণয়ে এথ্‌নলজিস্টদের সম্পর্কে বীরবলী ব্যঙ্গকে লক্ষ্য করে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন: "অনুমান করা কঠিন নয় রবীন্দ্রনাথ যদি এ আলোচনা করতেন কৌতুকের শুভ্রহাস্যে ও দুটি-একটি উপমার বিস্ময়ের চমকে একটি রসবস্তু গড়ে উঠত। রামেন্দ্রসুন্দরের হাতের বিজ্ঞানবুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলোতে এ অপবিজ্ঞানের সমস্ত ফাঁক প্রকট হত। প্রমথ চৌধুরী বিজ্ঞানের চর্মে ঢাকা অজ্ঞানের বুকে সোজাসুজি ছুরি বসিয়েছেন। সে ছুরির ধার ও ঔজ্জ্বল্য চোখে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু সে ছুরি যে খুন করার ছুরি তাতে সন্দেহ থাকে না।" (১)

১। প্রবন্ধ সংগ্রহের (প্রথম খণ্ড) ভূমিকা।

তা হ'লে প্রমথ চৌধুরী কি বাংলা সাহিত্যের বৃন্তহীন পুষ্প? সমালোচকমহল এর সদুত্তর সন্ধান ক'রেছেন নানাভাবে। কেউ কেউ বলেছেন যে এর প্রধান কারণ তাঁর ফরাসী সাহিত্য অনুশীলন, (২) আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতিত্ব নির্ণয় করেছেন, (৩) আবার কেউ কেউ সংস্কৃত টীকাকারদের সঙ্গে তাঁর রচনারীতি ও মেজাজের তুলনা করেছেন। (৪) নিঃসঙ্গ একক বাংলা সাহিত্যের এই কুশলী শিল্পীটির জ্ঞাতি-গোত্র নির্ণয়ে গবেষণার অন্ত নেই। এই তিনটি মতেরই কিছু সারবত্তা আছে। এক সময় তিনি নিজেই বলেছেন: "ফরাসী সাহিত্য এই অর্থেই স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বে বলেছি যে, ফরাসী সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্ট দুইই আছে। ফরাসী মনের এই প্রসাদগুণ প্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসী লেখকরাই দিতে পারেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চাতেও ফরাসী পণ্ডিতদের সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না।" (৫)—ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্য শুধু সাহিত্য-সমালোচকের বিচারই নয় তাঁর নিজের সাহিত্যাদর্শের মাপকাঠিও বটে। প্রমথ চৌধুরীর সুমার্জিত বুদ্ধি, বিচিত্র জ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চায় সুকর্ষিত, কিন্তু তাঁর 'সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান' নষ্ট হয় নি। ফরাসী গল্প সাহিত্যের একটি বিশেষ পরিচয় আছে—লঘুপদক্ষেপের দ্রুতসঞ্চারী গতি, বুদ্ধি-মার্জিত তীক্ষ্ণতা ও হৃদয়াবেগ মুক্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ফরাসী গল্পের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে অতি তরুণ বয়সেই তাঁর একটি আত্মিক যোগ ঘটেছিল। তাঁর 'আত্মকথা'য় ফরাসী সাহিত্য অনুশীলনের বর্ণনা আছে—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছ থেকেই তিনি এ রসের দীক্ষা পেয়েছিলেন। (৬)

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর জ্ঞাতিত্ব আবিষ্কার করেছেন অনেকেই। প্রমথ চৌধুরীও স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-রসিকতার সুরে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা বলেছেন। তবে

২। "আমাদের ভক্তিরস-মদির আনুগত্য মন্থর মনোরাজ্যে তিনি ফরাসীদেশ-সুলভ লঘুচপল ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা-বিমুখ, অথচ মার্জিতরুচি সেবাত্মিকা মনোবৃত্তির আমদানী করিয়াছেন।"—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। "সম্প্রতি কোন সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর।"—ভারতচন্দ্র: প্রবন্ধ সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)

৪। "প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাষ্যকার ও টীকাকারদের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বড় তাঁদের সূক্ষ্ম অথচ বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ধারা, এবং বিপুল শব্দসম্পদের প্রয়োগনৈপুণ্য এই প্রোজ্জ্বলবুদ্ধি অসাধারণ শব্দকুশলী বাঙালী লেখককে মুগ্ধ করেছিল।"—প্রমথ চৌধুরী: শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত: বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪৪।

৫। ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়: নানাকথা।

৬। "দাদা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে অনেক ফরাসী বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, 'তুমি ঘরে চুপচাপ ক'রে ব'সে থাক, ফরাসী শেখ না কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করব।' সেই থেকে ফরাসী বই পড়ার অভ্যাস হয়ে গেল।"—আত্মকথা, ৭৮ পৃঃ।

ভারতচন্দ্রের তিনি যে একজন রসজ্ঞ পাঠক, তার প্রমাণ তাঁর বহু রচনাতেই বিদ্যমান। সম্ভবত ভারতচন্দ্র থেকে এত বেশি উদ্ধৃতি আর কোন লেখকের রচনায় নেই—প্রমথ চৌধুরীর লেখাতেও ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গই সবচেয়ে বেশী। কাল ও রুচির এত পার্থক্য, তথাপি কেমন করে যে অষ্টাদশ শতকের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর এই বিদগ্ধচিত্তটির মিল হ'ল তা ভাবতে গেলেও অবাক হতে হয়। প্রমথ চৌধুরীর মতে বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের মতো শিল্পী আর হয় নি: "Bharatchandra, as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language."(৭) অনেকে এ প্রশ্নও ক'রেছেন যে প্রমথ চৌধুরীর মতো অভিজাতরুচি লেখক ভারতচন্দ্রকে কেমন ক'রে বরদাস্ত করলেন? এর উত্তর দিয়েছেন তিনি নিজেই: "ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন। (৮) প্রমথ চৌধুরীর ভারতচন্দ্রপ্রীতির দ্বিতীয় কারণ বোধহয় রায়গুণাকরের ভাষার সংহতিগুণ। কোন কোন সমালোচক এমন কথাও বলেছেন যে প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের যুগে জন্মগ্রহণ করলে রায়গুণাকরের গোষ্ঠীর লেখক হতেন, আবার একালে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হ'লে তিনি সবুজপত্রের নিয়মিত লেখক হতেন। (৯)

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আর একটি কারণে সংযোগসূত্র সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর আত্মকথায় নিজেকে 'কৃষ্ণনাগরিক' ব'লে দাবি ক'রেছেন। ভারতচন্দ্রও একজন খাঁটি কৃষ্ণনাগরিক। প্রায় দু'শতাব্দীর ব্যবধান হ'লেও নাগরিকতার এই ঐক্যে তাঁরা অভিন্নহৃদয় প্রতিবেশী। প্রমথ চৌধুরীর বাল্যকালেও কৃষ্ণনগরে সঙ্গীত, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও হাস্যরসের রীতিমতো চর্চা হতো। কৃষ্ণনগরের হাস্যরসিকতা সম্বন্ধে বলেছেন: "সব জিনিষ হেসে উড়িয়ে দেওয়া তাদের স্বভাব ছিল। ঠাট্টা জিনিসটেরই তারা চর্চা করতো।" (১০) এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ ও অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগর এক নয়—প্রায় দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী বললেও হয়। তবে এ কথাও ঠিক যে একালের 'বীরবল' চৈতন্যদেবের নয়নাশ্রু ও হৃদয়াবেগচর্চার উত্তরাধিকারী নাহ'লেও, নব্যন্যায়ের সঙ্গে তাঁর মনের একটি যোগ ছিল। কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক পটভূমিকার পরিচয় দিতে গিয়ে যথার্থই বলা হ'য়েছে: "একদিকে যেমন নবদ্বীপধামের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাদের অপূর্ব ও বিচিত্র জ্ঞানালোকে সমগ্র ভারতভূমিকে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিতেন, তেমনিই আবার নদীয়া জেলার—কৃষ্ণনগরের অধিবাসিবৃন্দের শিষ্টাচার, সদাচার, রসিকতা, শিল্প-নৈপুণ্য ও সাহিত্যানুরাগ

৭। The story of Bengali literature.

৮। ভারতচন্দ্র: প্রবন্ধ সংগ্রহ।

৯। "একথা একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে চৌধুরী মহাশয় ভারতচন্দ্রের যুগে জন্মিলে রায়গুণাকরের গোষ্ঠীর কবি হইতেন, আবার ভারতচন্দ্র বর্ত্তমান যুগে জন্মিলে সবুজপত্রের লেখকরূপে সাহিত্যে অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইতেন।"—বাংলার লেখক: প্রমথনাথ বিশী।

১০। আত্মকথা।

এ দেশে সর্বত্র নব-নব আদর্শ ও সৎশিক্ষার প্রসার বা বিস্তার সাধন করিত।" (১১) যথার্থ কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ চৌধুরীর চিত্তলোকে যে এর ছায়া পড়বে, তাতে আর বিচিত্র কি ?

অনেক বড় জার্মাণ লেখকদের লেখা তাঁর ভাল লাগেনি, অথচ ফরাসি লেখকদের লেখা তাঁর ভালো লেগেছে। এর কারণ হ'লো ফরাসি লেখকদের প্রকাশের তুলনাহীন নিপুণতা। যত বড় লেখকই হন না কেন, প্রমথ চৌধুরীর কাছে ভাষার শৈথিল্য ছিল অসহ্য, ঢিলেঢালা লেখা তাঁর কাছে ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন টীকাকার ও ভাষ্যকারদের মধ্যে এই গুণটি তিনি প্রভূত পরিমাণেই পেয়েছিলেন। টীকাকারদের যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা, বাকনৈপুণ্য ও শব্দ-প্রয়োগের সংহতিগুণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। যুক্তিতর্কের গাঢ়বদ্ধ ভাষা তিনি চিরকালই পছন্দ ক'রেছেন। তিলকের গীতাভাষ্যটি এক সময় তাঁকে মুগ্ধ ক'রেছিল। এই মহাগ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি যা ব'লেছেন তা প্রাণধানযোগ্য : "মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থে যে বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান, যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা যথার্থই অপূর্ব। সমগ্র মহাভারতের নৈলকণ্ঠীয় ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, পরিমাণে এর চাইতে ছোট। তাইতে মনে হয় যে এ ভাষ্য মহাত্মা তিলক প্রাকৃতে না লিখে সংস্কৃতে না লিখলেই ভালো করতেন।" (১২) প্রমথ চৌধুরীর মনের দোসর তাই বিচিত্র—নিজের মানস-মিতার সন্ধানে প্রাচীন ভারতবর্ষ, অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণনগর ও ফরাসী সাহিত্য—এই আপাত বিরোধী ভাবজগতগুলি পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। তাঁর লেখা পড়েই বোঝা যায় এদের সংযোগসূত্র কোথায়। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক-পিতৃপুরুষ নির্ণয়ের এই বিচিত্র রূপ এক হিসেবে বর্ণসঙ্কর হলেও, বৃহত্তর অর্থে সগোত্র।

দুই

প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্র' আজ প্রায় একার্থবোধক হ'য়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক আদর্শের আলোচনায় তাই সবুজপত্রপর্ব আলোচনা অপরিহার্য। সাধারণভাবেই সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে সাময়িক পত্রের একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। তার ওপর সবুজপত্রের মতো পত্রিকা। গদ্য রচনারীতির অভিনব কর্ষণা ছাড়াও কালের দিক থেকে এই পত্রিকাটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সবুজপত্র যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগের বিদ্রোহী সন্তান, (১৩) তাই তার আচরণ ও বাগ্‌বিন্যাসেও এই বিদ্রোহের বক্র তির্যক ভঙ্গিটী স্পষ্টরেখায় স্বাক্ষরিত। নব্যতন্ত্রী সাহিত্যিকদের প্রকাশের মাধ্যম হ'য়ে উঠল এই ভাষা। 'সবুজপত্র' নাম ও পত্রিকার মলাটের সবুজ রঙ ছিল বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। সবুজ তারুণ্যের বর্ণ, প্রাণধর্মের বর্ণপত্র—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' বাণীটি ছিল এই পত্রিকার মূলমন্ত্র। আমাদের সমাজে জীবনরসিকতার যে অভাব দেখা গিয়েছে সেই প্রসঙ্গে চৌধুরী মশায় যে শ্লেষোক্তি করেছেন, তা মূল্যবান : "তাই আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় দল, আমাদের মনকে

১১। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী। পৃঃ ২।

১২। মহাভারত ও গীতা : প্রবন্ধ সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)

১৩। বাংলা ১৩২১ (১৯১৪) সালে সবুজপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।

রাতিরাতি পাকা করে তুলতে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে, কোনরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই আমাদের মনের রং পেকে উঠবে।...এরা ভুলে যান যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, মৃত্যুকে যেন প্রাণের দ্বারস্থ করি। অপর দিকে এদেশের ভক্তিযোগীরা অর্থাৎ কবির দল কাঁচাকে কচি করতে চান। এঁদের ইচ্ছা সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত ক'রে দিয়ে ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনো আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না।" (১৪) 'সবুজপত্র' পত্রিকার মর্মমূলে এই শ্রেণীর একটি স্পষ্টোচ্চারিত, সঙ্কল্প-কঠোর জীবন-সমালোচনা ছিল। এই জীবন-সমালোচনাই পত্রিকাটির স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে।

'সবুজপত্র' পত্রিকায় চৌধুরী মশায় যে জীবন-রসিকতা দাবী ক'রেছেন, তার আড়ালে সম্ভবত তাঁর সাহিত্যধর্মের একটি ইংগিত আছে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর হাস্যরস অত্যন্ত দুর্লভ। প্রমথ চৌধুরী যে শ্রেণীর হাস্যরস পরিবেশন করতে চেয়েছেন, তাতে জীবনরসিকতার একটি বড়ো স্থান আছে। জীবনের একটি উজ্জ্বল ও প্রসন্ন রূপ দেখেছেন তিনি, কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কার-প্রবণতা ও নৈতিকদৃষ্টি সেই প্রসন্ন ও পরিপূর্ণ রূপটিকে আচ্ছন্ন ক'রেছে। প্রমথ চৌধুরী আমাদের সামাজিক জীবনের সেই জীবন-বিধ্বংসী দুর্লক্ষণকে আঘাত হানতে চেয়েছেন, দূর করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর হাস্যরসের সঙ্গে এই শ্রেণীর জীবনাচরণের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। প্রমথ চৌধুরীর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যাদর্শের এইখানে একটি নিগূঢ় মিল আছে। আসল কথা আমাদের জীবনের বহু অসঙ্গতি তাঁর চোখে পড়েছিল—পূর্ণাঙ্গ ও বলিষ্ঠ জীবন ছিল কাম্য। সবুজপত্রের যাত্রাপথ নির্ণয়ে তাঁর এই কামনাই রূপায়িত হ'য়েছে মাত্র। শুধু গদ্য রচনাতে নয়, কবিতাতেও তিনি শ্লেষ-চতুর কণ্ঠে বলেছেন :

"হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদঘর্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক। (১৫)

সবুজপত্রের রচনাবলী যদি শুধু এক জাতীয় সাহিত্য-বিদ্রোহই হতো, তাহ'লে তার প্রভাব এমন সুদূরপ্রসারী হওয়া সম্ভব ছিল না। আসল কথা এ বিদ্রোহ এক জাতীয় জীবন-বিদ্রোহও বটে। এই কারণেই রচনারীতি, বক্তব্য ও জীবন—তিনটিকে এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মনে করবার কোন কারণ নেই।

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে সবুজপত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নানা দিক থেকে। পত্রিকার প্রচলিত রীতি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিজ্ঞাপন, ছবি, 'ফিচার' শ্রেণীর নয়নরঞ্জন কোন

১৪। সবুজপত্র : বীরবলের হালখাতা।

১৫। বার্ণার্ডশ : সনেট পঞ্চাশৎ।

কিছু তাতে থাকত না। সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথ—ছ'জনের লেখাই পত্রিকার বারো আনা জুড়ে থাকত। আসলকথা পত্রিকার পরিকল্পনার মূলে কোন ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল না, নব্যতন্ত্রী সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। আভিজাত্য ও কৌলিন্য এর চালচলন ও রুচিতে ফুটে উঠেছে। এর দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। গত প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার প্রাক্কালে যে নবীন চিন্তাধারা বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ভূমিকে নূতন ফসলের সম্ভাবনায় উর্বর করে তুলেছিল, সবুজপত্র সেই আধুনিক চিন্তাধারার বাণীবাহক। বক্তব্য ও বলার অভিনব স্টাইল দুই-ই সবুজপত্রের দান।

সবুজপত্রের সবচেয়ে বড় কাজ ভাষা আন্দোলনের সারথ্য করা। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের একটি মীমাংসা সবুজরত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে ওঠে। অবশ্য সবুজপত্র প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল থেকে কথ্য ভাষাকে সাহিত্যিক কৌলিন্য দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকেই কথ্যভাষার সাহিত্যিক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাচার নক্সা' কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করার প্রাচীনতম নমুনা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনীতে, পত্রসাহিত্যে ও স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কিছু রচনায় কথ্য ভাষার সুমার্জিত রূপ ও রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাক্-সবুজপত্র যুগের কথ্যভাষার প্রয়োগ-পদ্ধতির মূলে সর্বজনীন স্বীকৃতি ছিল না, তাছাড়া এগুলি একটি বিস্তৃত আন্দোলন নয়, বিক্ষিপ্ত ও পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা মাত্র। সবুজপত্র পত্রিকা অবলম্বন করে কথ্য ভাষার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক উদ্যমমাত্র নয়,—এর বিস্তৃতি ও প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মর্যাদাবাহী। তাছাড়া 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাচার নক্সা'র ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার একটি রূপ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কথ্য ভাষা বলতে গিয়ে যা বোঝায় এ ভাষা ঠিক তা নয়। (১৬) প্রমথ চৌধুরীর কথ্যভাষা আঞ্চলিক ভাষা হয়েও আঞ্চলিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। কারণ কৃষ্ণনগর এককালে সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থানে পরিণত হ'য়েছিল। বাক্-বৈদগ্ধ্য ও কথা-বিন্যাস কুশলতায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীটির খ্যাতি প্রায় একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে পরিণত হ'য়েছিল। দীর্ঘকাল ভাষাকর্ষণার ফলে এই আঞ্চলিক ভাষাটি একটি 'সর্বজন বোধগম্য' সাহিত্যিক আভিজাত্য লাভ ক'রেছিল। সবুজপত্রের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই ভাষাই শ্রীসমৃদ্ধ সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হ'ল। অবশ্য প্রাক-সবুজপত্র যুগে চৌধুরী মশায়ের নিজেরই রচনায় চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও পরিচ্ছন্ন বক্রোক্তি-জীবিত ভাষার নমুনা পাওয়া যাবে। এমনকি তাঁর সাধুভাষায় রচিত যে দুএকটি প্রবন্ধ প্রাক্-সবুজপত্র যুগে প্রকাশিত হ'য়েছিল, তাতেও তাঁর মৌলিক রূপ-রচনার বিস্ময়কর

১৬। "আলাল ও হুতোম প্যাচার নক্শা বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত, তাহাদের ভাষাকে মৌখিক ভাষা বলা উচিত নয়। সাহিত্যের মৌখিক ভাষা সাহিত্যের লৈখিক ভাষার মতই দেশব্যাপী পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আঞ্চলিক ভাষা সে দাবী করিতে পারে না। (প্রমথ চৌধুরী : বাংলার লেখক : প্রমথনাথ বিশী)

পরিচয় আছে। 'জয়দেব' প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত হলেও প্রমথীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব নেই। (১৭) সবুজপত্র পত্রিকা প্রকাশের ফলে গদ্যরীতির সুমার্জিত কর্ষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছেন তিনি। সবুজপত্রেই চৌধুরী মশায়ের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুলদানি' গল্পটি একটি ফরাসি গল্পের অনুবাদ। 'সবুজপত্র' কথাসাহিত্যিক প্রথম চৌধুরীর প্রধান বাহন হ'য়েছিল। এইখানেই তাঁর অধিকাশ ছোটগল্প প্রকাশিত হ'য়েছিল; ঘোষাল ও নীললোহিতের মতো অসাধারণ কথকদের আবির্ভাবও সবুজপত্রেই। সবুজপত্রের মাধ্যমে চৌধুরী মশায় আমাদের তন্দ্রাতুর জরাগ্রস্ত মনকে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই জাগরণের জন্য ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্চার কথাও বলেছেন তিনি—তবে ইউরোপের বহিরঙ্গিক অনুকরণের ব্যর্থতার কথাও তিনি বলেছেন। ইউরোপের সাহিত্যে জড়তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার মতো উপাদান আছে, কিন্তু সেই উপাদান যেন বাংলা সাহিত্যে 'পরগাছার ফুল' এর মতো শোভা না পায়—বাংলা সাহিত্যের প্রাণধর্মের সঙ্গে যেন মিশে যায়। তিনি বলেছেন: "আমাদের বাংলা ঘরের খিড়কি দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড়ভাজার মৃৎ কুম্ভের মধ্যে সাতসমুদ্রকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টা করতে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনো সহজ সাধন পদ্ধতি আমাদের জানা নেই।" (১৮)

তিন

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনার প্রকৃতি নির্দেশ করতে হ'লে সবুজপত্রের পর্বে বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনার ইতিহাস জানতে হবে। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির পটভূমির ওপরেই প্রমথ চৌধুরী তথা সবুজপত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্র সাহিত্যের মোড় পরিবর্তনের কিঞ্চিৎ দায়িত্ব সবুজপত্রেরও আছে—এই দিক দিয়ে পত্রিকাটির গুরুত্ব অসাধারণ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনে একটি দ্রুত পরিবর্তনের সুর সুস্পষ্ট হয়ে আসছিল—অন্তর্জীবনের এই সুর-পরিবর্তনকেই সবুজপত্র আরও মুখর ক'রে তুলেছিল। সবুজপত্রের তারুণ্যের বাণীর সঙ্গে কবির এই পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ় তারুণ্যের একটি গভীর মিল আছে। কবি ব'লেছেন: "আমাদের সমাজে যে পরিমাণ কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে

১৭। জয়দেব প্রবন্ধ সম্পর্কে চৌধুরী মশায় নিজেই ব'লেছেন: "সে প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করি। 'ভারতী'র সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি উক্ত প্রবন্ধের বহু অংশ বাদ দিয়ে সেটি ছাপান।... বহুকাল পরে সেটি 'সবুজপত্র'-এ পুনঃ প্রকাশিত করি। এর কারণ, সেটি আবার পড়ে দেখলুম যে আমি আমার মত পরিবর্তন করি নি। সেটি অবশ্য তথাকথিত সাধু ভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, আমার লেখার সব দোষগুণই তাতে বর্তমান।" আত্মকথা, ৯৪ পৃঃ।

১৮। সবুজপত্রের মুখপত্র: নানাকথা।

পদে কেবলি বাধা। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙ, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল, নয় বলিতে হয় ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে, কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির হইয়া আছে।" (১৯) 'বলাকা' কাব্য ও 'ফাল্গুনী' নাটকের মূল বক্তব্য থেকেই এই সময়ের কবিমানসের স্বরূপধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। সবুজপত্রের একটি সংখ্যায় শুধু কবির ফাল্গুনী নাটকই ছিল। তারুণ্যধর্মিতা ও দৃপ্ত প্রাণবন্দনার কাব্য বলাকা। 'ফাল্গুনী' নাটকেও নূতন আশাবাদ ও প্রাণের ছন্দ স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে। এই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা কবি একখানি চিঠিতে বলেছেন: "I had been struggling during these last few days in a world where shadows held sway and right proportions were lost. ...Now I feel that I am emerging once again into the air and light and breathing freely." (২০) রবীন্দ্রসাহিত্যের সবুজপত্রপর্ব বাস্তবিকই আলো-হাওয়া রচিত একটি প্রাণ-সমুজ্জল ইতিহাস। শুধু কাব্যনাটকেই নয়, গদ্য সাহিত্যেও একটি নূতন যুগের সূচনা হ'ল। দীর্ঘকাল পরে আবার ছোটগল্প লেখার প্রেরণা এল—কিন্তু এ গল্পগুলি পদ্মালালিত গল্প থেকে স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র শুধু বক্তব্যে নয়, বাক্‌রীতির নবীনতায়ও। পদ্মালালিত গল্পগুলিতে এক অপরূপ প্রসন্নতা ও ছায়ালোক-স্নিগ্ধ রমনীয়তা আছে। সবুজপত্র যুগের গল্পগুলির বুদ্ধিমাজিত সংক্ষিপ্ত অথচ শ্লেষগাঢ় বাক্‌রীতি, ক্লাইমেক্স-অ্যান্টিক্লাইমেক্সের দ্রুতসঞ্চারী আরোহ-অবরোহ ও আকস্মিক পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত রেখা বিস্মিত করে। 'ভারতী' 'সাধনার' যুগের ভাষাচারণার সঙ্গে সবুজপত্র যুগের ভাষাবিন্যাসের পার্থক্য স্পষ্টগোচর।

রবীন্দ্রনাথের দু'খানি উপন্যাস সবুজপত্রেই প্রকাশিত হয়: 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'। 'চতুরঙ্গে'র ভাষা ক্রিয়াপদ ব্যবহারের দিক থেকে সাধুভাষার লক্ষণাক্রান্ত হ'লেও প্রাক্‌-সবুজপত্রের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। হৃদয়াবেগের আতিশয্য এই ভাষায় অনুপস্থিত, অস্পষ্টতা ও অতিভাষণের স্থান এখানে নেই। ইস্পাতের মতো কঠিন এর ভাষার বাঁধুনি, মননের দীপ্তিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। এ ভাষায় রাজকীয় ঐশ্বর্য নেই সত্য, কিন্তু আতিশয্যহীন বুদ্ধিমাজিত গদ্যরীতির একটি নিজস্ব রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের কথা সাহিত্যে যে অপরূপ গদ্যরীতির সাক্ষাৎ মেলে, তার প্রথম পদক্ষেপ 'চতুরঙ্গ'এর ভাষাবিন্যাসে রূপ পেয়েছে। 'চতুরঙ্গ'এ তবু কবির ভাষা-সংস্কার শেষ হয়নি, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ভাষা আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। এপিগ্রামের সূক্ষ্ম-চতুর প্রয়োগ, ভাষার দ্রুতসঞ্চারী লঘুতা 'ঘরে বাইরে'-র ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের রূপ ও রীতির এই পরিবর্তনের মূলে 'সবুজপত্র'-এর দান কম নয়। (২১) তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীর রচনা সম্পর্কে যত সপ্রশংস

১৯। সবুজপত্র: ১৩২১, বৈশাখ।
২০। Letters, 23rd May, 1914.
২১। "This, certainly, is a singular distinction for Pramatha Choudhuri, for he alone of Rabindranaths' Juniors influenced the poet without being influenced by him."—An acre of green grass: Buddhadev Bose. Page 16.

উক্তি ক'রেছেন, সম্ভবত রবীন্দ্র-কনিষ্ঠদের আর কারো ভাগ্যে তেমন ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যেমন উৎসাহিত ক'রেছেন তেমনি শ্রদ্ধাও ক'রেছেন। চৌধুরী মহাশয়ের কর্মনিষ্ঠা, পালিশ করা রচনারীতি রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল। বহুবার তিনি তাঁর রচনারীতি সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। একবার তিনি লিখেছিলেন: "তোমার গদ্য প্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি—কোথায় ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। এগুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়।...তোমার গদ্যরচনা রীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের পাঠকরা তার পূরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়। গদ্য লেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখিনি।" (২২) রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি থেকেই প্রমথ চৌধুরীর রচনাকুশলতা, ও তিনি যে তথাকথিত 'জনপ্রিয়' সাহিত্যিক ছিলে না তা বেশ বোঝা যায়।

প্রমথ চৌধুরীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন, তা থেকে সবুজপত্রের আমলের বাংলা সাহিত্যের পরিস্থিতিও বেশ বোঝা যায়। প্রমথ চৌধুরীর পাঠক-সংখ্যা যেমন সীমাবদ্ধ তেমনি তাঁর পত্রিকার পাঠক-সংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। তাই সবুজপত্র যুগান্তকারী পত্রিকা হলেও জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল না। 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক ও নায়ক প্রমথ চৌধুরী, কিন্তু এর অন্তরালের প্রাণশক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সবুজপত্রকে লালন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নানা প্রকার যুক্তি বুদ্ধি উৎসাহ দিয়ে কবি প্রকারান্তরে সবুজপত্রের সারথ্য করেছেন। সবুজপত্রের ভালো লেখাকে তিনি যেমন উৎসাহিত করেছেন তেমনি ত্রুটি থাকলে তাও নির্দেশ করতে ছাড়েন নি। তাছাড়া নবীন লেখকদের নানাভাবে আগ্রহশীল ক'রে তোলা ছিল কবির উদ্দেশ্য। সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সবুজপত্রের লেখকসংখ্যা ছিল অত্যন্ত মুষ্টিমেয়। কিন্তু যাতে তরুণ সাহিত্যিকেরা সবুজপত্রে লেখেন, এ বিষয়ে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে বহু চিঠি লিখেছেন। ১৩২৬-এ লেখা একখানা চিঠিতে দেখি কবি কায়মনোবাক্যে সবুজপত্রের পাতায় নূতন লেখকদের আবির্ভাব দাবি করেছেন: "কিন্তু নবীন লেখক চাই। তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্চে না কেন? সবুজপত্রের সভার পোনের আনা আসন আমরাই যদি জুড়ে থাকি তা-হলে কালব্যতিক্রম দোষ ঘটে।" (২৩) কবির মনে কিছু কাল ধ'রে এক ধরণের অস্বস্তি দেখা যাচ্ছিল। সবুজপত্রে যদি নূতন একদল লেখক সৃষ্টিই না হ'ল, তা হ'লে এর উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হবে না। তার ওপর এর অধিকাংশ লেখাই রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর,—রবীন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে এই অবস্থাটা ভালো লাগেনি। পরবর্তী চিঠিতে বলেছেন: "সবুজপত্র পড়ে খুসি হ'লুম। কিন্তু আরো লেখক দরকার। লেখা সৃষ্টির চেয়ে লেখক সৃষ্টির বেশী দরকার। লেখা সৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায় কিন্তু এখনো বেশী দূর পর্যন্ত সবুজপত্রের টান পৌছচ্চে না। নবীন লেখকেরা সবুজপত্রের আদর্শকে ভয় পায়—তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।" (২৪) রবীন্দ্রনাথের এই অকুণ্ঠ আনুকূল্য

২২। চিঠিপত্র, পঞ্চমখণ্ড:
২৩। চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড: প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র, ৭৮নং।
২৪। ঐ, ৭৯নং।

সবুজপত্রের যাত্রাপথের সবচেয়ে বড় পাথেয় হ'য়ে উঠেছিল। যখনই সবুজপত্রে ভালো লেখার অভাব হয়েছে, তখনই কবির অক্লান্ত লেখনী সহস্রধারে অমৃত পরিবেশন ক'রেছে।

সবুজপত্রের যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই সময়ের বিভিন্ন সাহিত্যিক বিতর্ক। চিরাচরিত ব্যবস্থার জায়গায় নূতন কিছু দেখা দিলেই নানাদিক থেকে সক্ষুব্ধ প্রতিবাদ দেখা দেয়। বলা বাহুল্য সবুজপত্রের সঙ্গেও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার বিরোধ ছিল। আজ বিরোধ মিটে গেছে, কিন্তু সেকালের বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি ঐতিহাসিক মুহূর্ত এর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে। এই বিরোধের সবচেয়ে বড়ো কারণ হ'লো সবুজপত্রের ভাষাদর্শ। সবুজপত্রের বিরোধী পত্রিকাগুলির মধ্যে 'মানসী' ও 'নারায়ণ'ই ছিল প্রধান। প্রমথ চৌধুরীর স্বরচিত ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি মূলত বিতর্ক থেকেই উদ্ভূত হ'য়েছে। মাঝে মাঝে চৌধুরী মশায়ও এই বিরোধী দলের আক্রমণে বিপন্ন বোধ ক'রেছেন, কিন্তু সব সময়েই অভয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তৎকালীন 'সবুজপত্র'-বিরোধিতার বিষয় রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতে জানা যায়: "সাহিত্যে তোমার প্রতিষ্ঠা যতই দৃঢ় হতে থাকবে ততই তোমার উপর ধাক্কা বেশী পড়বে—যারা মাঝারি মানুষ তাদের সুবিধা এই যে তাদের মাথার অনেক উপর দিয়ে তুফান চলে যায়। আমি দেখেছি যত রাজ্যের বাজে লোকের কথায় তোমাকে উদ্বেজিত করে—তুমি বাজে লোককে কিছু বেশী নাই দিয়েও থাক—তার একটা কারণ তুমি তাদের দুর্বাক্যকে এখনো ভয় কর।" (২৫) বাংলা সাহিত্যের অচলায়তন ভাঙার ব্রত নিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী, মাথার ওপরে ছিল চিরযৌবনের কবি রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ পাণি। আধুনিক মনন ও বিংশ শতাব্দীর নূতন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত এখানেই। সবুজপত্র থেকেই বিংশ শতকীয় বঙ্গসাহিত্যের সূচনা,—প্রমথ চৌধুরী তার পার্থ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পার্থসারথী।

২৫। চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ৩৬নং।

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

চরণদাস খবর জানে বৈকি। আজ কদিন হল সে-ই ত মির্জাপুরের একটা ঘরে সত্যজিৎকে নিয়ে যাচ্ছে। বালি-খসা মান্ধাতা আমলের বাড়ীটার নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতালার একটা ঘরে আরও কয়েকজন ছেলের সঙ্গে সত্যজিৎ বসে শোনে অবাক হয়ে সেই একটু দোহারা চেহারার চশমা পরা লোকটির কথা।

সেসব কথা শুনে সত্যজিতের মনে রোমাঞ্চ জাগে। ঐ লোকটির মত সেও একদিন এমনি করে বলবে। বলবে পার্কে হাজার হাজার লোকের সমাবেশে দাঁড়িয়ে। সেদিন ওয়েলিংটনে এই ভদ্রলোকটির বক্তৃতা শুনতে শুনতে একে কেমন দূরলোকের বলে মনে হচ্ছিল। এখন দেখছে তারই মত সাধারণ একজন লোক। সত্যজিৎ মনের মধ্যে বল পায়। সেও নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়। রাজনৈতিক পাঠচক্রে চরণদাসই জোর করে তাকে টেনে এনেছে প্রথম দুদিন। এখন নিজে থেকেই আসছে সত্যজিৎ। এখানে আসতে আজকাল মনের মধ্যে রীতিমত তাগিদ অনুভব করে। ওই ভদ্রলোকটির সঙ্গে চরণদাস ওর আলাপ করিয়ে দিয়েছে। এখন চোখাচোখি হতে ভদ্রলোক হেসে স্বাগত জানালেন। আজ ক্লাস শেষ হবার পর তিনি নিজে থেকেই বললেন—চলুন সত্যজিৎবাবু, একসঙ্গে যাওয়া যাক। আপনি ত বিডন ষ্ট্রীটের দিকে যাবেন?

সত্যজিৎ ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

চরণদাস বললে—চলুন, আমিও যাব ওদিকে।

হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—আপনাদের দুজনকে আমাদের দরকার। তৈরি হয়ে নিন। কাজে নামতে হবে কিছুদিনের মধ্যে।

—দিন না কিছু কাজ। চরণদাস বললে।

—আরো কিছুদিন যাক। আপনাদের স্টাডি সার্কল যেমন চলেছে চলুক। কিন্তু আপনারা আলাদা করে একটু পড়াশুনা করুন। এই নিন, সত্যজিৎবাবু, এই বইটা পড়ে ফেলবেন গোপনে। বইটা কিন্তু প্রসক্রাইড। সাবধানে পড়বেন। নিন পকেটে পুরে ফেলুন।

মলাট দেওয়া বইটা সত্যজিতের হাতে দিলেন ভদ্রলোকটি।

—কি বই ওটা? চরণদাস জিজ্ঞেস করে।

—ফাঁসীর সত্যেন। আপনিও পড়বেন বইটা।

—আচ্ছা।

—আর দেখুন, আজকাল স্পাই বসেছে আপনাদের ওখানে। আজ লক্ষ্য করলুম লোকটাকে।

—স্পাই! সত্যজিতের কণ্ঠে বিস্ময়। সামনাসামনি কোন দিন দেখেনি। ডিটেকটিভ বইএ পড়েছে। আর আজ তারই গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে স্পাই ঘুরছে। রোমাঞ্চ জাগে মনে বুকের মধ্যে একটু দোলাও লাগে ভয়ের।

জীবন পথে চলতে চলতে পরিচিত পরিবেশ থেকে সত্যজিৎ নতুন এক পরিবেশে এসে পড়েছে। তার মধ্যেই ওর মন নানা জল্পনা-কল্পনা করছে, আর তাকেই পরিচিত পরিবেশ বলে মনে করছে। রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষা ওর মধ্যে বিশেষকে জাগ্রত করেছে। সত্যজিৎ নিজেকে সাধারণের থেকে বিভিন্ন করে ভাবছে। ওর আত্মশ্লাঘা ওকে বাড়ীর পরিবেশ থেকে, শান্তির মিষ্টি আকর্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

—সতু, সতু—চীৎকার করে ডাকছে চরণদাস।

ঘুম ভেঙে গেছে কিন্তু তার আমেজ ছিল সত্যজিতের চোখে। তাই চরণের চীৎকারে চমকে ওঠে সত্যজিৎ।

—কোথায় রে? এই দিদি, সতে কি করছে রে?

শান্তি বললে—ঘুমুচ্ছে বোধহয়।

এই সময় সত্যজিৎ এল, বললে—কী ব্যাপার? এত সকালে?

—এত সকালে? মুখ ভেংচে উঠল চরণদাস। তারপর স্বরটা একটু গম্ভীর করে বললে—জামাটা গায়ে দিয়ে নে। দরকার আছে।

—এখুনি আসছি। সত্যজিৎ চরণদাসকে আর খোঁচায় না।

পঙ্কুর চায়ের দোকানের কাছে আসতেই চরণদাস সত্যজিৎকে বললে—গুপীদাকে একটা কথা বলে আসি, দাঁড়া। তারপর ও এগিয়ে গেল দোকানের কাছে।

—কি রে, খবর কী বিটলভাই? বলাইচাঁদ জিজ্ঞেস করলে।

—খবর বড্ড খারাপ। পরে বলব বলাইদা। গুপীদা এদিকে একটু শোন।

গোপীনাথ নেমে এল রাস্তায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে। সত্যজিৎ লক্ষ্য করে, চরণ চুপি চুপি কি বললে, গোপীনাথ ঘাড় নেড়ে সায় দিল। চরণ বেশ উত্তেজিত। বড় রকমের কিছু একটা ঘটেছে। তারই খবর জানাতে ব্যস্ত।

সত্যজিৎও উৎসুক। জানতে চায় নতুন কি ঘটল।

—চ। সত্যজিতের পিঠে হাত দিল চরণ।

—ব্যাপার কী?

—খুব সিরিয়াস, কি যে হবে! চরণদাসের কণ্ঠে হতাশার সুর।

—কেন?

—সুভাষ বোস পালিয়েছেন বাড়ী থেকে—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে।

—সে কী!

—এই ত সেদিন জেলেতে অনশন করলেন রাজবন্দীদের দাবী নিয়ে, তারপর স্বাস্থ্যের জন্যে বাড়ীতে নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন।

—ব্যাপার কী, কিছু জানিস। সত্যজিতও উত্তেজিৎ হয়ে ওঠে।

—আমি হরিদার কাছে গিয়েছিলাম খুব ভোরে। সেখানেই শুনলাম। কাল ত হরিদাকেও নিয়ে গিয়েছিল এস, বি অফিসে। আমি ভেবেছিলাম হরিদাকে ছাড়বে না। অমনি একটা ষ্টেটমেন্ট নিয়ে হোম-ইনটার্ণ অর্ডার দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

—তাই না কী?

—কিছু ত খবর রাখবি না, কাজও করবি না। খালি বই নিয়ে বসে থাকবি। বই নিয়ে বসে থাকার দিন কী আর আছে! একটু ভাব বাপু ভাব।

—কী ভাবব?

—ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না। আগুন ধরানোর কাঠ-খড় একটু-আধটু জোগাড় করো। সুভাষবাবু পালানোর সঙ্গে সঙ্গে এস, বি খুব অ্যাকটিভ হয়ে গেছে। সাবধানে চলাফেরা করবি। পাড়ায় ওয়াচার ঘোরাঘুরি করছে।

—আমাদের কি ধরবে নাকি? সত্যজিৎ বলে।

—ধরতে কতক্ষণ, আমার পেছনেও ত ফেউ লেগেছে।

ফেউ লেগেছে! সারা দেশ জুড়ে ফেউ। তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষগুলোকে। কিছু করতে দেবে না। ভাল হলেও না। সত্যজিৎ ভাবে চলতে চলতে। অমন একটি সুন্দর মানুষ। কী সুন্দর না দেখতে। আর কণ্ঠস্বর? শুনলে গাটা শিরশির করে ওঠে। এই ত সেদিনও দেখেছে তাঁকে। চরণের সঙ্গে যেত সত্যজিৎ কলেজ ষ্ট্রীটের সেই ঘরটায়, আর পাড়ার বিডন পার্কে। সেবার সেই কর্পোরেশনের ইলেক্শনের সময়—স্পষ্ট যেন দেখতে পায় সত্যজিৎ—কী ভীড় সেদিন, ঐ ভীড়ের মধ্যে কোণের দিকে উঁচু জায়গায় গান্ধীটুপি পরা চশমা চোখে মানুষটি, হাজার হাজার লোকের মনকে নিজের দিকে একাগ্র করে রেখেছিলেন। কী আগ্রহ নিয়েই না সত্যজিৎ সেদিন তাঁকে দেখেছিল, তাঁর বক্তৃতা শুনেছিল।

—পা চালা, দেরি হয়ে গেছে। চরণদাস পা চালায়।

কত কাজ তার, কত দায়িত্ব। সে ত এখন আর ছোট নেই। কত বোঝে, কত বিজ্ঞ সে তার থেকেও। চরণদাস তার থেকে অনেক, অনেক এগিয়ে গেছে। সত্যজিৎ ঘাড় নীচু করে চরণকে অনুসরণ করে আর ভাবে। কতটুকুই বা সে করেছে দেশের জন্যে। দেশের কাজ করার প্রতি এতদিন সে কোন আগ্রহই প্রকাশ করেনি। চরণই জোর করে ধরে নিয়ে গেছে ওদের আড্ডায়, ক্লাসে। সুভাস বোসের নিরুদ্দেশের খবরটা শুনে তার আজ মনে হচ্ছে সেও যেন জড়িয়ে আছে দেশের কাজের সঙ্গে। এ ব্যাপার নিয়ে তাকে ভাবতে হবে। রোমাঞ্চ অনুভব করে সত্যজিৎ।

পনরো

মুখুজ্জে বাড়ীর আরও একটি ছেলে স্মরজিৎ। সেও পথের মোড় ঘুরল। পরীক্ষার খবর যখন বিপিন শুনল, তখন বললে—থাক আর পড়তে হবে না। দোকানে বেরুবি আমার সঙ্গে। কাজও বাড়ছে।

স্মরজিৎও যেন এমনি একটা কিছু খুঁজছিল। পড়তে তার ভাল লাগে না। তারপর আবার সত্যজিৎদের সঙ্গে পড়তে হবে। লজ্জা করে স্মরজিতের। তাই কাকার প্রস্তাবটা মনে ধরল।

কয়েকদিন হল স্মরজিৎ দোকানে বেরুচ্ছে। দোকানে বেশ ভালই লাগছে স্মরজিতের। নানা জাতের নানা খদ্দের—দরদস্তর, কেনাবেচা নিয়ে কোথা দিয়ে সময়টা কেটে যায়। ফেরে সেই রাত আটটা নটা। বাড়ীতে গাটা ধুয়ে কিছু মুখে দিয়ে বন্ধুসন্ধানে বেরোয়। বন্ধু কমেছে স্মরজিতের। এত রাতে জনতিনেকের সঙ্গে দেখা হয় আড্ডাঘরে। ঠিক যেন জমে না।

—দূর মাইরি, তুইও খুড়োর কলে গিয়ে পড়লি শেষ পর্যন্ত। মোটা শিবু বলে। সেও ফেল করেছে। পড়বে না আর। এদিকে ব্যবসা বা চাকরী করার তাগিদও নেই। বেশ কিছু রেখে পিতৃদেব সম্প্রতি গত হয়েছেন। বাড়ীতে বিধবা মা আর এক বোন। সম্প্রতি এক মামা এসে রয়েছেন।

—তোর কি বল? বাবা বেশ কিছু মালকড়ি রেখে গেছে। আমাদের ত তা নেই।

—কি যে বালিস তুই, কোন মানে হয় না। তোর অমন রোজগেরে বাবা-কাকা রয়েছে।

—বাবা-কাকা ত চিরকাল থাকবে না। এখন থেকে না শিখলে ভবিষ্যতে পেছনে টায়ার বেঁধে ভিক্ষে করতে হবে যে। স্মরজিৎ মুরুব্বি চালে বলে।

—তা মন্দ বলিস নি তুই। তা তোদের লাইনে আমাকেও একটু স্কোপ করে দেনা।

—বেশ ত, আয় না। দালালি শিখবি। মোটা ইনকাম, যদি ম্যানেজ করতে পারিস।

—বেশ, কথা রইল। কাল থেকেই যাব তোর সঙ্গে। দুপুরটা মাইরি কাটতে চায় না। বোদেটাও চাকরীর উমেদারীতে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। একা একা কতক্ষণ আর ভাল লাগে।

—কি রে বোদে, কিছু হল?

—না ভাই, বাবার অফিসের সায়েবটা বড্ড ঘোরাচ্ছে। বাবা বলছেন হয়ে যাবে।

—ও সব চাকরী-টাকরীর আশা ত্যাগ কর। যুদ্ধ বেশ ভাল করেই লাগছে রে। যা হোক একটা কিছু ধরে ব্যবসার লাইনে নেমে যা। আখের ফিরবে।

—দেখি বাবা কি বলে। বঙ্কিনাথ যেন একটু হতাশই হয়ে পড়েছে। ছাপোষা মধ্যবিত্ত। অনেকগুলো ভাইবোন। রোজগার একজনের। তাই পাশ করলেও বঙ্কিনাথের বাবা বলে দিয়েছেন আর পড়াতে পারবেন না। যাহোক একটা চাকরীতে ঢুকতেই হবে।

আড্ডাঘর বটুকবাবুর বাড়ীতে কয়েমী হবার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাটা চলে রাত নটা থেকে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত।

(ক্রমশঃ)

স্মরগরল

হীরেন বসু

কতই বা বয়েস হবে সুপ্রভার। বিয়েও বেশিদিন হয়নি। এর মধ্যেই কিন্তু বুড়িয়ে গেছে। আদিত্য ওকে ঠাট্টা ক'রে বলে, 'কুড়িতেই বুড়ি!'

সুপ্রভা চটে না, উল্টে বলে, 'আমি না হয় কুড়িতেই বুড়ি, আর তুমি যে পঁচিশেই বাহাত্তুরে।'

এ সব বাক্যালাপ অবশ্য দুজনের মন-মেজাজ ভাল থাকলে তবেই হয়। বেশির ভাগ সময়ই চলে কথার হুল-ফোটানো। এক একদিন সকাল থেকে সুরু হয় এবং তার ফলে কতকগুলো বাঁধা-ধরা ঘটনা ঘটবেই। যেমন, আদিত্য আধ-পেটা খেয়ে অফিস যাবে, অফিসে কাজে ভুল করবে, তারপর ছুটির সময় অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ী না এসে চৌরঙ্গী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবে। বাড়ী ফিরবে হেঁটে হেঁটে, অনেক রাত্তিরে, জনশূন্য ডালহাউসি স্কোয়ার পাক দিয়ে। আর আশ্চর্য, রাত্তিরের নিঝুম ডালহাউসি স্কোয়ারে এলেই ওর মনটা কেমন শান্ত হয়ে আসবে। এদিকে আদিত্য অফিস বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই সুপ্রভা রাগ ক'রে ভাতের হাড়িতে জল ঢেলে দেবে। তারপর যখন খেয়াল হবে ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া হয়নি, তখন জল থেকে ভাত ছেঁকে ওদের খাওয়াতে বসবে। এতক্ষণ যে রাগ মনে মনে গুমরে মরছিল, এবার তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে ছেলেমেয়েদের অবাধ্যতা দেখলে। বড় মেয়েটা চার বছরের। বেশি চড়চাপড় খায় সে-ই। তারপরের দুটি ছেলে। কোলে মেয়ে। যতক্ষণ না ছেলেমেয়েদের চোখের জল থালার ভাতে মিশবে আর কান লাল হয়ে উঠবে, ততক্ষণ সুপ্রভার রাগ খানিকটাও অন্তত পড়বে না। নিজে কিন্তু সারাদিন না খেয়েই থাকবে সুপ্রভা। শুধু চা খাবে বার বার। রাত্তিরে আদিত্য ফিরে সন্ধি স্থাপন করলে তবেই সুপ্রভা মুখে ভাত গুঁজবে।

এইভাবেই দিন কাটছে। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। প্রথম পরিচয়ের পর যখন মনে মনে সেতুবন্ধন চলছে, তখন সুপ্রভা কত স্বপ্নই না দেখেছে। ছোট ফ্ল্যাট। ঝকঝকে তকতকে। ছোট সংসার। ভালবাসার নীড়। ফুটফুটে ছেলেমেয়ে একটি কি দুটি।

রঙীন চশমার ভেতর দিয়ে সুপ্রভা জগতটাকে দেখেছিল। প্রথম প্রেমের ছোঁয়ায় ওর দেহে তখন লাবণ্যের জোয়ার এসেছে। সুপ্রভা কলেজে পড়ে, আর আদিত্য একটা দিশী ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার। মোটা মাইনেই পেত। আদিত্যর সংসারে কেউ ছিল না। একা একটা ছোট ফ্ল্যাটে থাকত।

বিয়ের পর মাসখানেক সেই ফ্ল্যাটেই ছিল সুপ্রভা। একখানি মাত্র শোবার ঘর, সঙ্গে একটি ছোট কিচেন। ঘরখানি বেশ বড়। একা আদিত্যর পক্ষে অসুবিধা না ঘটলেও সুপ্রভা আসার পর ওখান থেকে উঠতে হল।

এল ওরা চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউএর এক দুই কামরাযুক্ত ছিমছাম ফ্ল্যাটে। সুপ্রভার আনন্দের সীমা নেই। ওর রাত্রের স্বপ্নজগত যেন এখানেই নেমে এসেছে। সুখী হয়েছিল আদিত্যও। সুপ্রভাকে ভালবেসে, ঘর বেঁধে ওর জীবনের বাঁধনহারা নৌকাটা যেন অবশেষে কূল পেল।

সুপ্রভার দিনগুলো ভালই কাটছিল। সিনেমা দেখে, নতুন নতুন শাড়ী পরে, নতুন নতুন ডিজাইনের গয়না গায়ে দিয়ে। তারপর একদিন জানতে পারল, ও সন্তানের মা হতে চলেছে। তখন আরো, আরো যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেল সুপ্রভা। বাইরে বেরুনো কমল বটে, কিন্তু বাড়ীতে বসে কী এক আনন্দে ও আত্মহারা হয়ে উঠল। একবার জানলায় দাঁড়ায়, একবার রেডিও শোনে, কখনও সোফায় আধ-শোয়া অবস্থায় গল্পের বইয়ে চোখ বুলোয় কিম্বা কবিতা আবৃত্তি করে। আদিত্য ওর এই ছেলেমানুষী দেখে আর উপভোগ করে। আগে আগে বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে আদিত্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলত। আজকাল সে পথ একেবারেই ত্যাগ করেছে। এখন অফিসে থেকে সোজা বাড়ী চলে আসে। আসে একটা কিছু হাতে নিয়ে।

সোফায় গা এলিয়ে আদিত্য যখন বই বা কোন কিছু পড়ে, সুপ্রভা তখন খাটের ওপর বসে থাকে। রেডিওয় গান হয়। গান শুনতে শুনতে সুপ্রভার মনটা কেমন যেন আবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সামনে পাঠরত সুপুরুষ আদিত্য, রেডিওর গান, ওর আসন্ন সন্তান আর বাইরের কালো অন্ধকার সব যেন একাকার হয়ে যায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সুপ্রভা সামনের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে বোধ হয়।

আদিত্যর হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়তেই বলে ওঠে, 'কী সুন্দর!'

সুপ্রভা আদিত্যর দিকে চোখ ফেরায়।

আদিত্য বলে, 'তুমি যেন দিন দিন আরো সুন্দর হচ্ছ।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

খুসিতে ঝলমল ক'রে ওঠে সুপ্রভা। বলে, 'সময় ত হয়ে এল। এবার যেতে হবে হাসপাতালে।'

'ভয় করছে নাকি?'

এক ঝলক হাসি। তারপর 'করছে বইকি।' চুপ। আবার, 'কালো মেয়ে হলে কিন্তু আমি হাসপাতালেই শেষ শয্যা নেব।'

'সে কী! কালো হবে কেন? তোমার অমন দুধে আলতা রঙ—'

আরক্ত হয় সুপ্রভা, 'যাও—'

আদিত্য হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

সুপ্রভা বলে, 'আচ্ছা ধর যদি হাসপাতাল থেকে আর না ফিরি, তুমি কাঁদবে?'

'কোন দুঃখে?'

'আমার দুঃখে।'

আদিত্য তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, 'তোমার দুঃখে কাঁদতে যাব কেন। তপস্যা আরম্ভ করব।'

'তপস্যা! কিসের তপস্যা?'

'কোন একটি মেয়ের।'

'ঠাট্টা হচ্ছে?'

'ঠাট্টা কেন? তোমাকে পেতে যেমন তপস্যা করতে হয়েছে, তেমনি আবার তপস্যা করব।'

সুপ্রভা রাগ ক'রে বলে, 'যাও, শুনতে চাই না।'

'আচ্ছা, আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

নির্জন অন্ধকার রাস্তায় চলমান গাড়ীর হেডলাইট অকস্মাৎ জ্বলে উঠে যেমন পথিককে সচকিত করে, তেমনি বিগত দিনের এক ঝলক আলো সুপ্রভার মুসরে-পড়া মনকে সজোরে ঝাঁকুনি দেয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আলো নিভে গেলেই অন্ধকার।

তখন কী সুপ্রভা জানত যে আলোর পরেই অন্ধকার। না, বুঝতে পেরেছিল হাসপাতাল থেকে ফিরে দেখবে ওর সুখের দিন শেষ হয়েছে। প্রথম কয়েকদিন কিছুই মনে হয়নি সুপ্রভার। আদিত্যর বাড়ীতে বসে থাকা একান্তই স্বাভাবিক ঠেকেছিল। সবে ও হাসপাতাল থেকে ফিরেছে, এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি, ভেবেছিল আদিত্য তাই কদিন ছুটি নিয়েছে। তাছাড়া, কোলের শিশু নিয়ে ওর ব্যস্ততার অন্ত নেই। সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। তার পরিচর্যা করতেই ওর সারাদিন কেটে যেত। অতশত ভাববার সময় কোথায়? আদিত্যও যেন ওর জীবন থেকে সাময়িকভাবে সরে গিয়েছিল। এখন সুপ্রভা-বুঝতে পারে কেন আদিত্য তখন দিনের পর দিন বসবার ঘরে চুপচাপ বসে থাকত, একটা সামান্য কথা জিজ্ঞেস করলেও কেন রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকাত।

ঘুণাক্ষরেও কী সুপ্রভা ভেবেছিল যে সুখের নীড় থেকে ছিটকে পড়তে হবে পঙ্ককুণ্ডে। জীবনের পাতা-লাইনের ওপর দিয়ে-যে ঘটনার রেলগাড়ী একটানা দ্রুতগতিতে ছুটে যাবে, তা ছিল একেবারে কল্পনার বাইরে।

পর পর সাতদিন কেটে যাবার পর একদিন সন্ধ্যায় কী মনে করে সুপ্রভা বসবার ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘরের জানলা দুটো বন্ধ। সবুজ বাতি জ্বলছে। আর তার আবছা আলোয় সুপ্রভা দেখল, আদিত্য সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে। সুপ্রভা-যে ঘরে ঢুকেছে আদিত্য টের পায়নি।

তাই সুপ্রভা যখন বললে, 'ব্যাপার কী? তোমার কোন অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?' আদিত্য ভীষণভাবে চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, না, ঠিক অসুখ নয়।' এই জাতীয় কিছু বলতে যাচ্ছিল আদিত্য, সুপ্রভা ওকে বাধা দিল। হঠাৎ-ই তখন সুপ্রভার মনে পড়ে গেছে, আজ কদিন হল আদিত্য অফিস যাচ্ছে না, বললে, 'অফিস যাচ্ছ না কেন?'

এতদিন যেকথা আদিত্য মনে মনে চেপে রেখেছিল, মুখ ফুটে বলতে পারেনি, যতবার বলতে গেছে সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে, ভেবেছে সুপ্রভা আঘাত পাবে, অপ্রত্যাশিত আঘাত, হয়ত সামলাতে পারবে না, আজ তা কেমন অনায়াসে বলে ফেলল। কিছুমাত্র ভূমিকা করল না, গলার স্বর একটুও কাঁপল না, স্বচ্ছন্দে বললে, 'চাকরী নেই।' তারপর 'কেন নেই?' এই প্রশ্ন হতে পারে মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে গেছে।'

সোফায় উঠে বসে আদিত্য সুপ্রভার মুখের দিকে তাকাল। সুপ্রভা যেন পাথর হয়ে গেছে। নির্বাক দৃষ্টি আদিত্যর মুখের ওপর। আদিত্য অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তাড়তাড়ি বললে, 'আহা, তুমি অত ঘাবড়ে গেলে কেন?'

আদিত্য একথা সুপ্রভাকে বললে বটে, কিন্তু সে নিজেও কম ঘাবড়ে যায় নি। সামান্য একটা ডিগ্রীর পুঁজি নিয়ে সে চাকরীর অকূল সমুদ্রে হালে পানি পাবে কী করে। যাঁর কৃপায় সে ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের পদে বসতে পেরেছিল, এখন তাঁকেই হয়ত জেল খাটতে হবে। ব্যাঙ্কের তহবিল নয়ছয় করেও কী আর তিনি পার পেয়ে যাবেন।

এরপর অনিবার্যভাবেই সুপ্রভা-আদিত্য সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ এক সঙ্গে নেমে গেল। তাতে আদিত্যর কোন আপশোষ নেই। কারণ সে ভাগ্য মানে। দুর্ভাগ্য তাদের অর্থের দিক দিয়ে নিঃস্ব করল বলে কী তাদের ভালবাসাও মরে যাবে। সুপ্রভা বলে, হ্যাঁ। আদিত্য তা মানতে পারে না। সে কিছুতেই মানতে চায় না যে, এখন তার রোজগার আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে বলে তাদের ভালবাসাও সেই অনুপাতে কমে যাবে। ভালবাসা কথাটা কী আপেক্ষিক? মনে মনে প্রশ্ন করে আদিত্য, একেক দিন, যখন সুপ্রভার মুখ থেকে কিছু কটু মন্তব্য শুনে মেজাজটা বিগড়ে যায়।

সুপ্রভা যেদিন জানতে পারল, ওদের আর একটি সন্তান আসছে, সেদিন থেকে ও আরো উগ্র মূর্তি ধারণ করল। এখন আদিত্যের একেবারেই নিস্তার নেই। দুজনে মুখোমুখি হলেই বিস্ফোরণ। কথা-কাটাকাটি। ঘুমুলে তবেই শান্তি।

আদিত্য সেজন্যে আজকাল প্রায়ই অফিস থেকে বাড়ী ফেরে রাত্তির করে। সুপ্রভা তাতে কিছু অসন্তুষ্ট হলেও নিশ্চুপ থাকে। আদিত্যকে খেতে দেয় এবং নিজে খায় নিঃশব্দে। দুএকটা টুকিটাকি কাজকর্ম সারে। তারপর মাটিতে বিছানা পেতে ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

অফিস থেকে বেরিয়ে আদিত্য কোন কোন দিন পুরোনো আড্ডায় যায়। সেখানে চুপচাপ বসে থাকে কিম্বা তাস খেলে। আবার যেদিন এসব ভাল লাগে না সেদিন চৌরঙ্গী পাড়ায় ঘোরা-ফেরা করে, কি ময়দানের কোন নির্জন গাছের তলায় গিয়ে বসে। মনটা তখন এলোমেলো ইতিউতি ঘোরে ফেরে। চৌরঙ্গী কফিহাউসেও যায় মাঝে মাঝে। নানা মানুষের সমাবেশে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। ভাল লাগে ছড়িয়ে দিতে। অফিসের বদ্ধ ঘর আর গৃহের কলহখিন্ন পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

এমনই এক সন্ধ্যায় নিজেকে আদিত্যর ভয়ানক একা-একা মনে হল। কদিন আগে সুপ্রভার সঙ্গে উষ্ণ বাক্য-বিনিময়ের পর সেই যে কথা বন্ধ হয়েছে, এখনও তার জের কাটেনি। অথচ আদিত্য মনে মনে হাঁপিয়ে উঠেছে। কিন্তু ওপক্ষ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

অফিস থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আদিত্য কফিহাউসে হাজির হল। সেখানে তখন বিশেষ সোরগোল। সান্ধ্য-আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। খানিকটা ভেতরে ঢুকে আদিত্য একটা খালি চেয়ার খুঁজছিল, এমন সময় নজরে পড়ল ডানদিকে একটা থামের পাশে জনৈক তরুণের মুখোমুখি বসে আছে যে মেয়েটি সে হল সুস্মিতা। সুপ্রভার সঙ্গে কলেজে পড়ত। সুস্মিতাও তাকে দেখতে পেয়েছে। হাতছানি দিয়ে ডাকল। আদিত্য এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের টেবিলে বসে পড়ল।

সুস্মিতা বললে, 'সুপ্রভা কেমন আছে?'

আদিত্য সামনে গম্ভীর হয়ে বসে-থাকা, তরুণটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই সুস্মিতা সচকিত হল। ওদের পরস্পর আলাপ করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললে, 'ওঃ আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।' আদিত্যকে বললে, 'ইনি আমার স্বামী দীপঙ্কর সেন। সম্প্রতি বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেছেন।' তারপর দীপঙ্করকে বললে, 'ইনি আমার বন্ধু সুপ্রভার স্বামী আদিত্য রায়।'

দীপঙ্কর আদিত্যর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, 'হাউ ডু ইউ ডু—'

সুস্মিতা বললে, 'তারপর আদিত্যবাবু, আপনাদের খবর কী বলুন?'

আদিত্য অন্যমনস্ক ছিল। ভাবছিল সুস্মিতা-দীপঙ্করের কথা। ওরা নিশ্চয় জীবনে খুব সুখী হয়েছে। মনে আছে সুপ্রভা বলেছিল, দীপঙ্কর বনেদী পরিবারের ছেলে। বাপের যথেষ্ট পয়সা আছে। তার ওপর আবার একমাত্র সন্তান। সুস্মিতাও বড় ঘরের মেয়ে। চেহারায় আভিজাত্যে সেকথা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। সুতরাং ওদের এই রাজজোটক মিল সুখের হয়েছে নিশ্চয়। শুনেছে, মারা যাবার আগে সুস্মিতার বাবা তাঁর বিপুল সম্পত্তির এক অংশ ওকে দিয়ে গেছেন। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএ থাকতে সুস্মিতা সুপ্রভার কাছে প্রায়ই আসত। এমন কী, বৌবাজারের এঁদো গলিতেও কয়েকবার এসেছে। ওদের বিরাট গাড়ী গলিতে ঢুকত না। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত। ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে যেত। দীপঙ্করের সঙ্গে তখন কোর্টশিপ চলছে। তারই নিত্য নতুন কাহিনী বলত প্রাণের বন্ধু সুপ্রভার কাছে। শেষ যেদিন ওদের বাড়ী আসে সেদিন নিজেদের মোটরে ক'রে নয়, ট্রামে ক'রে আসে। একা একা। সুপ্রভকে জানায়, 'ভাই, বাড়ীর অমতেই বিয়ে করতে হচ্ছে। দীপঙ্করের সঙ্গে বিয়েতে বড়দার ভীষণ আপত্তি। কী জানি কেন, দীপঙ্করকে বড়দা একেবারেই দেখতে পারে না।'

তারপরে সুস্মিতা একেবারেই নিখোঁজ। আজ ওদের দেখে আদিত্য ভাবল, তাহলে সুস্মিতা সত্যি সুখী হয়েছে।

সুস্মিতা হেসে বললে, 'কী এত ভাবছেন?'

আদিত্য সচেতন হল। সুস্মিতার প্রসাধন-স্নিগ্ধ সপ্রতিভ মুখের দিকে তাকাল।

'সুপ্রভা পরীক্ষা দিল নাকি?'

'পরীক্ষা! কিসের পরীক্ষা?' বিস্মিত কণ্ঠে বললে আদিত্য।

'কেন, শেষ যেবার আপনাদের ওখানে যাই, বলেছিল প্রাইভেটে বি, এ পরীক্ষা দেবো।

এবার মনে পড়ল আদিত্যর। বৌবাজারের এঁদো গলিতে এসেও সুপ্রভা বি, এ পরীক্ষা দেবার ইচ্ছেটা অনেকদিন লালন ক'রেছিল। বাসনা ছিল বি, এ পাশ ক'রে একটা চাকরীতে ঢুকবে। বছরখানেক আগে কিছুদিন খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে সুপ্রভা নানা জায়গায় দরখাস্ত পাঠাত। একবার একটা ইণ্টারভিউএর চিঠিও পেয়েছিল। শুনে আদিত্য বলেছিল, 'তোমার চাকরী হওয়ার কোন আশা নেই।'

'কেন, এরা ত ম্যাট্রিকুলেটই চেয়েছিল। আমি ইণ্টারমিডিয়েট বলে চান্স আরো বেশি।'

আদিত্য মুচকে মুচকে হাসছিল।

সুপ্রভা রাগ ক'রে বলে, 'হাসছ যে—'

'আমি সেজন্যে বলছি না। আসল কথা, তোমার ও চেহারায় চাকরী হবে না।'

এবার অবাক হয় সুপ্রভা

কথাটা খোলসা ক'রে আদিত্য, 'দেখনি, বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে স্মার্ট অ্যাণ্ড গুডলুকিং ইয়ং লেডি।'

এর পর যে প্রশ্নটা সুপ্রভার মুখে এসেছিল, তা আর উচ্চারণ না। বলতে যাচ্ছিল, 'আমি কী তোমার চোখে একেবারে কুচ্ছিত হয়ে গেছি?' সেকথা না বলে সুপ্রভা শুধু ইণ্টারভিউএর চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল।

কখন কফি এসেছে, কখন চুমুকে চুমুকে শেষ করেছে, আদিত্যের মনে নেই। সুস্মিতা যখন অভিযোগের সুরে বললে, 'আপনি আজ বড় অন্যমনস্ক' তখন দেখল বয় বিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বলতে হয় তাই যেন বললে আদিত্য, 'আমি দামটা দিয়ে দিচ্ছি।'

সুস্মিতা ততক্ষণে চুবড়ি-ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে থালায় রেখে দিয়েছে।

'আপনার বাড়িতে শীগ্‌গির একদিন যাব', সুস্মিতা বলে, 'তখন এর শোধ নেবেন।'

'অনেকদিন আসেননি। কবছর হল?'

'এখানে ছিলাম না। বিয়ের পরই দেশ ছাড়ি। এইত কিছুদিন মাত্র দুজনে একসঙ্গে ফিরেছি।'

'তা জানি। তাহলে একদিন সন্ধ্যায় দীপঙ্করবাবুকে নিয়ে আসুন।' তারপর দীপঙ্করের দিকে ফিরে আদিত্য বললে, 'আসছেন ত একদিন?'

দীপঙ্কর ঘাড় নাড়ল।

কফিহাউস থেকে তিনজনে এক একসঙ্গে বেরিয়ে যে যার পথে পা বাড়াল।

হাঁটতে হাঁটতে সুস্মিতা রাগত স্বরে বললে, 'তুমি আবার আমার সঙ্গে আসছ কেন?'

দীপঙ্কর সুস্মিতাকে হাত ধরে থামাল, 'তাহলে কী ঠিক করলে?'

'কী আবার ঠিক করব?'

'হিন্দুস্থান পার্কে যাবে না?'

'না।' বলে সুস্মিতা আশেপাশে তাকাল।

রাত নেহাৎ কম হয়নি। পথ নির্জন।

আদিত্য একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়েছে।

এবার সুস্মিতা দীপঙ্করের সামনাসামনি দাঁড়াল। দীপঙ্কর খানিকটা হতভম্ব হয়েছে। 'সুস্মিতার চোখ দুটো প্রতিজ্ঞায় অটল। শান্ত, অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'তোমাকে বলে দিচ্ছি, তুমি আর কখনও ফোনে আমায় ডেকো না কিম্বা চিঠিপত্তর কিছু দিওনা। বিলেতে তুমি আমাকে জালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছ এখানে আমি আর জ্বলতে চাই না। আমার শেষ কথা এই যে, মদ আর সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছুঁড়িটাকে যদি না ত্যাগ করতে পারো, তবে আমার দিক থেকে কোন সাড়াই পাবে না।'

বলে আর দাঁড়াল না সুস্মিতা। হন হন করে হাঁটতে লাগল।

আলোচনা

সাহিত্যিকের রাজনীতি

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে কথা হয়না, বলা যেতে পারে মুক্তি। তার চেয়ে অব্যাহতি বলাই ভাল। স্বাধীনতা অভাবাত্মক নয়, স্বভাবাত্মক—আর তা হচ্ছে, চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার অবাধ স্ফূতি! ইচ্ছার অবাধ স্ফূর্তি। মনে হতে পারে স্বেচ্ছাচার। যদি তাই হয়, দোষটা সংজ্ঞার নয়, গলদ বর্তমান সমাজের, যেখানে চিন্তা কেন্দ্রচ্যুত, অনুভূতির কণ্ঠরোধ, ইচ্ছার অপমৃত্যু পদে পদে। তবে এই সঙ্গেই বলে রাখা ভাল, মানবিক স্বেচ্ছাচার মানে পাশবিক বৃত্তির নিরংকুশ বিকাশ নয়, যদিও মানুষ পশু, তবে শুধু পশু নয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার দুটো বৃত্তিই বর্তমান, চরিত্রভেদে ও সময় বিশেষে পরিমাণের তারতম্য ঘটে। প্রতিযোগিতার মধ্যে আত্মতৃপ্তির সন্ধান অহংএর বিকার। এই বিকারেরই জারজ প্রজা অপরাপর হিংস্র বৃত্তিনিচয়। বৃত্তিগুলিকে নির্মূল করা নয়, যত করাই মনুষ্যত্বের অবিরাম প্রয়াস—একথা সিদ্ধিলিপ্সু যোগীর ক্ষেত্রে শুধু নয়, আদর্শ সামাজিকেরও এই লক্ষ্য। যে সব পণ্ডিত বলে থাকেন, ধনবন্টনের বৈষম্যেই প্রতিযোগী মনোভাব ও তজ্জাত বৃত্তিগুলি উপজাত হয়েছে—পুরাকালে ছিল না এবং অর্থনীতিক শোষণমুক্ত সমাজে রাতারাতি নির্বংশ হয়ে উবে যাবে—হয় তাঁরা প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধ, নচেৎ অজ্ঞতাকে দলগত স্বার্থের খাতিরে লালন করতে ভালবাসেন। আরেক ধরণের রাজনীতিক পণ্ডিত আছেন যাঁরা বৃত্তিগুলোকে স্বীকার করে বলে থাকেন, ধনবন্টনের সমস্যা মীমাংসিত হবার পর তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে অর্থাৎ মোড়ের মাথায় পৌঁছে ঠিক করা যাবে কী কী বাড়তি বোঝা চলার পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

পৃথিবীতে উল্লেখনীয় যাবতীয় রাজনীতিক মতামতই বর্তমানে অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ দ্বন্দ্বটা এখন প্রজাতন্ত্র-রাজতন্ত্র নিয়ে নয়, একনায়কত্ব-গণতন্ত্র নিয়েও নয়, মূলত ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র নিয়ে। অতি সম্প্রতি যে সর্বহারার একনায়কত্বে বায়ু-পিত্ত-কফের অসাম্য সমীক্ষণ করে সমাজতন্ত্রের মকরধ্বজ ও তৎসহ গণতন্ত্রের অনুপানযোগের ব্যবস্থাপত্র প্রচার করা হচ্ছে তারও ভিত্তিভূমি কিন্তু অর্থনীতিই।

অর্থনীতিক রাজনীতির পরম উদ্দেশ্য শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা; এবং সেই শোষণমুক্ত সমাজই দ্রুতলয়ে এমন এক জগৎকে সূচিত করবে যা যে কোনো মানুষের সবরকম কল্পনার ইষ্টভূমি, সত্য-শিব-সুন্দরের লীলা-নিকেতন, ন্যায় ও সত্যের রামরাজ্য, অধ্যাত্ম উন্নতির সত্যযুগ ইত্যাদি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতিকরাও কবিদের চেয়ে কোন অংশে কম ভালমানুষ নন। পার্থক্যটা হচ্ছে, কবিরা যেখানে-সেখানে বসেই কল্পনা বিস্তার করতে পারেন, অর্থনীতিক পণ্ডিতেরা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত যুক্তির সঙ্গে তাল ফেলে-ফেলে চলে দিগন্তরালে দৃষ্টিপ্রসার অবরুদ্ধ সেখান থেকে বেধড়কা কল্পনার ঘোড়া ছোটাতে প্রয়াসী। তথ্য ঘেঁটে ঘেঁটে ক্লান্ত হ'লে অতীতের জন্মবৃত্তান্ত সুরু

হয় উপকথা দিয়ে, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে করে বিরক্তি বোধ হলে ভবিষ্যতের কোষ্ঠি নির্দিষ্ট হয় রূপকথার পরমায়ুতে। অর্থনীতিক শোষণমুক্ত সমাজ মানেই মানুষের যাবতীয় অশুভবৃত্তির অপমৃত্যু এবং সদ্‌বৃত্তিগুলোর নিরাপদ ও আকস্মিক অভ্যুত্থান—এমন বে-আক্কেলে কথা উদ্বায়ু ব্যক্তিরাও লিখতে সংকুচিত হতেন। শেষ পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে, মানুষের হিংস্রবৃত্তি যদিবা থাকেই তাকে নিয়োজিত করা যাবে প্রকৃতিকে বশীভূত করার কাজে।

এ তো গেল সমষ্টিগত উদ্যমের ব্যাপার, ব্যক্তিগত বৃত্তিচর্যার ক্ষেত্রে? সমাজের মুখ চেয়ে না কি ব্যক্তিগত বৃত্তিকে নির্বাসিত করা হবে। কিন্তু কোথায় সেই দণ্ডকারণ্য! লাভের প্ররোচনাকে নিরস্ত করার জন্য লোভের বৃত্তিকে সংযত করা প্রয়োজন, এ শুভবুদ্ধির সূর্যোদয় যখন ঘটেছে তখন এটুকুও বোঝা উচিত লোভকে ব্যক্তির প্রাংগণ থেকে সমষ্টির প্রান্তরে ছেড়ে দিলে আপাত-দায়মুক্তির স্বস্তিশ্বাস হয়তো ফেলা যায় কিন্তু তার বীজ চারাগাছ না হয়ে বনস্পতির সম্ভাবনা বহন করে মাত্র অর্থাৎ সমষ্টিগত লোভ আকারে বিপুল ও প্রকারে সংঘাতিক হয়। আবার তা না হতে পারে, মাঝ-পথেই বিস্ফোরণে সমষ্টি তছনছ হয়ে যেতে পারে বিকৃত দলাদলিতে। কিন্তু শুধু লোভই তো মানুষের একমাত্র অসামাজিক বৃত্তি নয়।

অর্থনীতি মানুষের জীবনে অপরিহার্য হলেও মানুষের চিৎপ্রকর্ষের সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই। ততটুকুই যোগ যতটুকু না মিটলে স্বাধীনভাবে চিন্তাই করা যায় না। জীবিকার হাটে তার যতমূল্যই থাক্ না কেন, জীবনে বিকাশের ক্ষেত্রে তার স্থান অভাবাত্মক। সুতরাং অর্থনীতিক অভাব ও বিপত্তিকে অতিক্রম করা প্রয়োজন সন্দেহ নেই কিন্তু পথটাকে বড় করে দেখলে লক্ষ্যে পৌঁছবার উৎসাহ থাকে না, তাই বিপথে যেতেও ভুলবোধ হয় না। আদর্শ সমাজ গঠনের অছিলায় অর্থনীতিকে close-up দিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত বড় করে দেখানোর ফল কখনো মংগলজনক হতে পারে না। এতে অশুভ বৃত্তিগুলোকে কল্পনায় প্রশ্রয় তো দেওয়া হয়ই পরন্তু সেগুলোকেই শ্রেণী-সংঘাতের কাজে অপনিয়োগ করা হয় এই প্রত্যাশায় যে শ্রেণী-সংঘাতে জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তাভ বৃত্তিগুলো যেন গৈরিক বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে সমাজকল্যাণে বৈরাগ্যব্রতে দীক্ষা নেবে। আমার কথা হচ্ছে,

: অর্থনীতিকে বড় করে দেখানো চলবে না।

: প্রতিযোগী বৃত্তিগুলোকে এখন থেকেই শায়েস্তা করার চেষ্টা করা হবে। অবশ্যই কোন হঠযোগিক মার্গে নয়। ব্যায়াম করলে যেমন শারীরিক দুর্বলতা অপসৃত হয়ে স্বচ্ছপেশীস্ফীত সবল দেহ লাভ করা যায়, মানসিক অনুশীলনেও চিত্তবৃত্তিকে সুদৃঢ় সমাজ সহযোগী উন্নতমনা করা যায়।

: উপযুক্ত আলোবাতাস ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন শারীরিক ব্যায়ামের পক্ষে অপরিহার্য, যে কোনরকম শোষণ ও দমনমুক্ত আবহাওয়া তেমনি মানসিক অনুশীলনের উপকারী। কিন্তু অর্থনীতির চশমায় জগৎকে দেখলে চিৎপ্রকর্ষের কোনই সম্ভাবনা নেই। মানুষের যাবতীয় মানসসৃষ্টি—সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের উন্নত নমুনার সঙ্গে অর্থনীতির প্রত্যক্ষ কোন যোগই কোনকালে ছিল না।

: সৎসাহিত্য তথা সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা চিত্তবৃত্তিকে সমাজ-সহযোগী করার পক্ষে অনুকূল এবং হিংস্রবৃত্তি নিচয়কে সংযত করার পক্ষেও সহায়ক। তবে কী সাহিত্য-শিল্পকে প্রচার-কৃত্য সম্পন্ন করতে হবে? মোটেই নয়, বরং ঠিক বিপরীত।

সমাজের শৃংখলাকে অটুট রাখতে হলে ব্যক্তি-স্বেচ্ছাকে কিছু পরিমাণ খর্ব করতেই হয়, তা সে সমাজের গঠন যত সমাজতান্ত্রিকই হোক না কেন। কারণ যখনই সমষ্টির অনুপাতে ব্যষ্টির স্বেচ্ছাচারের আয়তনকে সীমা-সংকুচিত করতে হচ্ছে তখন ব্যষ্টিকেই ত্যাগ করতে হয়, তার পরিমাণ যত কমই হোক। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা বুঝি চিরকালের জন্যই নির্বাসিত।

সেই ত্যাগই স্বাধীনতার পরিপন্থী যে ত্যাগ বাধ্যতামূলক ও ব্যক্তির অনিচ্ছাঘটিত। কিন্তু মনের এক বিশেষ বৃত্তির প্রেরণায় ত্যাগ শুধু স্বাধীনতার প্রকাশকই নয়, ত্যাগীর ক্ষেত্রেই আনন্দদায়ক। আস্পদের জন্য প্রেমিকের ত্যাগ ইচ্ছাকৃত অথচ আনন্দগর্ভ। এ আনন্দের মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। ত্যাগের আনন্দই পরস্পরের বৃত্তিগত উপহার-বিনিময়, প্রেমের স্বভাবধর্মই যে এই।

সমাজের সব মানুষকে সেই ভালোবাসতে পারে যে বিশেষ কাউকে ভালবাসে না। নির্বিশেষ প্রেম দুর্বলতামুক্ত এবং abstract। মনটা ঠিক কপিকলের মতই—প্রতিযোগী মনোবৃত্তিকে টেনে যত নাবানো যায় সহযোগী বৃত্তির রসি ততই ওপরে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মসিদ্ধির বিজ্ঞাপন দেয় বায়ু-হিল্লোলিত abstract প্রেমের পতাকায়। বলা বাহুল্য আমি মুষ্টিমেয় ধনীদের দালাল হয়ে বিত্তবিহীনদের ত্যাগব্রতে দীক্ষা নিতে বলছি না। কারণ প্রেমের সম্পর্ক একাধারে নয় পারস্পরিক। যেখানে সমাজ ব্যক্তির কল্যাণ চায় না সেখানে ব্যক্তিও সমাজকে ভালবাসতে পারে না।

Human interestকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। সুতরাং আলাদা করে মানুষের জয়গান গাইবার দরকার হবে না সাহিত্যিকের। বিশেষ করে প্রচার-সাহিত্যের সঙ্গে সার্থক সাহিত্যের আন্তরিক বিরোধ। প্রচার-সাহিত্য অব্যর্থলক্ষ্য হলে বড় জোর emotionকে নাড়া দিতে পারে কিন্তু পারে না তাকে অতিক্রম করে নির্মল আনন্দ দিতে। তা দিতে পারলে, তার প্রচারই যে মাঠে মারা যাবে। কারণ রসোত্তীর্ণ সাহিত্যপাঠের total effect কোন বিশেষ বক্তব্য হতে পারে না—তা নিরবয়ব অনুভূতিমাত্র। আর এই নিরবয়ব অনুভবের মধ্যে একাকার হয়ে আছে : বাঞ্ছিত আনন্দ, চূর্ণিত মানব-প্রেম ও দ্রবীভূত কল্যাণবোধ।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

সমাজসমস্যা

সমাজে তরুণের স্থান

তরুণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নালিশের অন্ত নেই। উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, লঘুপ্রকৃতি ইত্যাদি প্রচুর বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় তাদের সম্বন্ধে, হয়ত সঙ্গত কারণেই। হয়ত তার চেয়েও গুরুতর অনুযোগের কারণ ঘটেছে গত কয়েক বছরে। একথা স্বীকার করে নিয়েও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তরুণ সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদির জন্য বিচ্ছিন্নভাবে শুধু তরুণদের দায়ী করা যায় কি? বস্তুত তরুণদের উপর দোষারোপে প্রবীণদের আত্মশ্লাঘা যতটা প্রকাশ পায়, ততটা দুর্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁদের সত্যিকারের কোন দুর্ভাবনা থাকলে তাঁরা সমস্যাটিকে আরও তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেন এবং তা হ'লে যে সমাজব্যবস্থার তাঁরা তল্পিবাহী, তার যথার্থতা নিয়ে তাঁদের মনে সংশয় দেখা দিত। এখানে প্রবীণ বলতে আমরা তাঁদেরই বলছি যাঁদের হামেশাই ট্রামে-বাসে পান-চিবোনো হাল্কা মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে দেখা যায় এবং সংখ্যাধিক্যের জন্য যাঁদের উপেক্ষাও করা চলে না।

স্পষ্টতই সামাজিক পরিস্থিতিতে এমন কিছু গলদ দেখা দিয়েছে, যার ফলে তরুণের পক্ষে বিপথগামী হওয়া প্রায় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যার সমাধানে নানা মত হবেই। বর্তমান প্রসঙ্গে আপাতত এই সমস্যার সমাধান আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য, আমরা তরুণদের কাছ থেকে কী আশা করি—সমাজে তরুণের স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের মীমাংসা না হ'লে তরুণ সম্প্রদায়ের বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, সব সমাজে তরুণের (কিম্বা প্রবীণের) স্থান একরূপ না। চীন দেশে বৃদ্ধের যে সম্মানলাভ ঘটে, তার এক দশমাংশও সম্ভবত আমেরিকার বৃদ্ধের জোটে না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তরুণের যে স্থান সেই তুলনায় আধুনিক সভ্যতায় তার স্থান অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন, কিম্বা একতরফা (unilateral) কি না, Pitrim A. Sorokinএর যুগান্তকারী গ্রন্থ Social and Cultural Dynamics প্রকাশের পর থেকে সেই প্রশ্নে যথার্থ কারণেই মতদ্বৈধতা থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ যে সনাতন বা অপরিবর্তনীয় নয় এই সিদ্ধান্ত সমাজবিজ্ঞানে সর্বজনস্বীকৃত। এ কথাও সত্য যে, সামাজিক পরিবর্তন সমগতিশীল নয়। যে সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন বাহ্যত প্রায় অদৃশ্য সেই সমাজকে স্থৈতিক * (static) সমাজ বলা চলে। কৃষিনির্ভর সমাজতন্ত্রের পূর্ণবিকাশের যুগে স্থৈতিক সমাজের উদাহরণ আমরা পাই। এই সমাজে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন আশু প্রয়োজনীয় নয়, প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির উপর আস্থা অটুট। স্বভাবতই এই সমাজ প্রবীণের অভিজ্ঞতার উপর একান্ত নির্ভরশীল, তাই প্রবীণের

* স্থিতিশীল শব্দটি আমাদের মনঃপুত নয়, কারণ শব্দটি স্থাণুর ভাবার্থ আনে। 'স্থিতাবস্থা' শব্দটিও একই কারণে অগ্রাহ্য।

স্থান অনেক উচ্চে। তরুণদের কর্তব্য অনেকাংশেই বাধ্যতায়, নিয়মানুবর্ত্তিতায় এবং ঐতিহ্যের ধারাবহনেই সীমাবদ্ধ। তরুণদের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত থাকে, তার যথোচিত ব্যবহার করা দূরের কথা, মনে হয় সেই শক্তির অবদমনেই সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। এই উক্তির সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় অনায়াসলভ্য, ভারতবর্ষে ত বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ।

চলিষ্ণু (dynamic) সমাজে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সমাজে পরিবর্ত্তনের তাগিদ তীব্র। এই তাগাদায় তরুণ সম্প্রদায়ের ডাক পড়ে সর্বাগ্রে। তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় শতগুণে। তা' ছাড়া বর্ত্তমান নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল যন্ত্রসভ্যতায় বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের যে মর্যাদা, বয়সের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মর্যাদা কখনই তার সমকক্ষ হতে পারে না; আর বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানলাভ প্রচুর সময়সাপেক্ষ নয়। এই কারণে প্রবীণের গুরুত্ব কমে যাবে স্বভাবতই। স্থৈতিক সমাজে গণআন্দোলন সর্বদা দৃষ্ট নয়, কিন্তু চলিষ্ণু সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গণআন্দোলন। আন্দোলন মাত্রেই তরুণ সমাজের মুখাপেক্ষী। তরুণদের একাংশ ছাত্রসম্প্রদায়ের গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়। নেতারা প্রায়ই ছাত্রসমাজকে সর্ববিধ আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু চুল না ভিজিয়ে যেমন সাঁতার কাটা যায় না তেমনি আন্দোলনে ছাত্রদের বর্জন বা ছাত্রদের আন্দোলন বর্জন করা প্রায় অসম্ভব।

অর্থকরী আয়ব্যবস্থা (mode of earning) তথা পরিবার প্রথার পরিবর্ত্তনেও তরুণ-প্রবীণের আনুপাতিক মর্যাদার তারতম্য ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক কৃষিসভ্যতায় আয়ব্যবস্থা পারিবারিকভাবে যৌথ। পারিবারিক আয়ে পরিবারের প্রায় সকলেরই (শিশু বাদে) অংশ ছিল, অবশ্য পারিবারিক কর্তার নেতৃত্বে। পেশা প্রায়শই পারিবারিক এবং পুরুষানুক্রমিক ছিল। এই ব্যবস্থা স্বভাবতই একান্নবর্ত্তী পরিবারের ধারক। এই ধরণের যৌথ আয়ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাপ তথা কৃতিত্ব এবং তদনুযায়ী ব্যক্তিগত গুরুত্বলাভের সম্ভাবনা নাই, ফলে অভিজ্ঞতা এবং পুরুষানুক্রমিক ব্যবস্থার মানসপ্রবণতায় পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এবং বয়সানুক্রমেই অন্যান্যের আনুপাতিক মর্যাদা এবং গুরুত্বের সৃষ্টি করে। আধুনিক যুগে এই পরিস্থিতিরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নাগরিক সমাজে আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের জের টানলেও এই পরিবার-প্রথায় যে অসেতুসম্ভব ফাটল ধরেছে তা' আমরা প্রত্যক্ষ জানি। এর কারণ, সামন্ততান্ত্রিক যৌথ আয়ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। আমাদের বর্ত্তমান আয়ব্যবস্থা ব্যক্তিমূলক। একই পরিবারে এক ভাই কেরাণী, এক ভাই ব্যবসায়ী, এক ভাই মিলে মজুর (উচ্চ নীচ উভয়বিধ হতে পারে)। তাদের আয় ভিন্ন পরিমাপ-সাধ্য এবং প্রায়শই একজনের আয় অন্যের চেয়ে অনেক বেশী এবং তা বয়সানুপাতিক না। ক্রমশই এই পরিচয়ে বয়সানুপাতিক মর্যাদা আয়-অনুপাতিক মর্যাদাকে স্থান ছেড়ে দিয়েছে। মূল পারিবারিক বন্ধন ও ঐক্যও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন; ভাতের হাঁড়ি আর বাড়ীর ছাদ ছাড়া নাগরিক একান্নবর্ত্তী পরিবারে আর কোন ঐক্য নেই। এই ধরণের পরিবারে প্রতিপালিত তরুণদের মানসিক গঠন কি রকমভাবে গঠিত হয় তাও অনুমেয়।

সর্বশেষে, তরুণ-প্রবীণের আনুপাতিক স্থান বা মর্যাদা নির্দ্ধারণে ধর্ম্মেরও একটা অবদান ছিল। স্থৈতিক সমাজে অধিকাংশ ধর্ম্মেই প্রবীণের প্রাধান্য নির্দিষ্ট ছিল। এ যুগে প্রচলিত অর্থে ধর্ম্মের যুগ শেষ হয়ে এসেছে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। নতুন যুগের ধর্ম্মে তারুণ্যের মর্যাদা যে বেড়ে যাবে তা নিঃসন্দেহ। তা' বলে প্রবীণত্বের জন্য অসম্মানের কোন প্রশ্নই ওঠে না, আসল প্রশ্ন সামাজিক গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

রেডিও-নাটক-সিনেমা

রেডিওয় 'চণ্ডালিকা'র হিন্দীরূপ

সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর অখিল ভারতীয় সঙ্গীত কার্যক্রমে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র হিন্দীরূপ প্রচারিত হল। সকলেই জানেন, 'চণ্ডালিকা' মূলতঃ নৃত্যনাট্য—নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত হলে তবেই এর পুরোপুরি রসাস্বাদন সম্ভব। কিন্তু রেডিও কিম্বা রেকর্ডে তার সুযোগ নেই বলে 'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্য হিসেবে পরিবেশিত হয়।

অখিল ভারতীয় সঙ্গীত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এযাবৎ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বড়কর্তারা গতানুগতিক অনুষ্ঠানেরই পোষকতা করে আসছেন। সেদিক থেকে দেখলে 'চণ্ডালিকা' গীতনাট্যের হিন্দী অনুবাদ প্রচার-প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাঙালীর আত্মশ্লাঘার যথেষ্ট কারণ আছে। শুধু বাঙালী কেন, সারা ভারতের অধিবাসীই এর অংশীদার হতে পারে। বিশ্বের কাছে আমাদের একটি বড় পরিচয়ই ত এই বলে যে আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক। অথচ রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত সাহিত্যভাণ্ডারের সামান্যতম অংশই হিন্দী তথা ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অপরিপুষ্ট হিন্দীভাষাকে আমাদের রাষ্ট্রনেতারা রাতারাতি মর্যাদার তখ্‌ত-এ-তাউসে বসাতে চাইছেন। এ-কাজে অনেকখানি সাহায্য হতে পারে যদি হিন্দী সাহিত্যের সৃজনশীল লেখকরা রবীন্দ্রসাহিত্যের হিন্দী-ভাষান্তরে মনোনিবেশ করেন। বাঙালী লেখকদের সহযোগিতায় কাজ অনেক সহজ হবে মনে করি।

কাব্যসাহিত্যের ভাষান্তর অবশ্য দুরূহ কর্ম। সকলের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, মূল কবিতার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য বজায় রেখে ভাষান্তর করতে পারেন একমাত্র উচ্চশ্রেণীর সৃজনশীল প্রতিভাসম্পন্ন কবিরাই। সুর বাদ দিলে আলোচ্য 'চণ্ডালিকা' কাব্যের পর্যায়ে পড়ে এবং অনেকে 'চণ্ডালিকা' কাব্য হিসেবে পাঠ করে থাকেন। রেডিওয় 'চণ্ডালিকা'র যে হিন্দীরূপ পরিবেশিত হল, তা বাংলা থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীহংসকুমার তেওয়ারী। এঁর অনুবাদ কেমন হয়েছে তা বিশেষ বোঝা যায়নি। কারণ, সেদিন আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকার দরুণ যান্ত্রিক নানা ধ্বনি সৃষ্টি হয়ে গানের বাণী সুস্পষ্টভাবে শোনার পথে অসুবিধা ঘটেছিল। তবে এটুকু বোঝা গেছে যে অনুবাদক তৎসম শব্দগুলোকে যথাযথ রেখেছেন এবং তা রেখে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন 'চণ্ডালিকা'র কাব্যরসের কোন হানি হয়নি, তেমনি আর একদিকে উদ্ভট কোন শব্দ আমাদের কর্ণপীড়া ঘটায়নি।

তবে আমার মতে, এক্ষেত্রে 'চণ্ডালিকা'র সুরের দিকটাই প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। 'চণ্ডালিকা'কে ভাষান্তর করতে গিয়ে অনুবাদককে পংক্তিগুলি কখনও ভাঙতে হয়েছে, আবার কোন কোন পংক্তি মূলের থেকে আকারে অনেক বড় হয়ে গেছে, কোন কোন জায়গায় ছন্দান্তরও করতে

হয়েছে। এই সমস্ত পরিবর্তনের পরও আসল সুর বজায় রাখা সহজসাধ্য নয়। এবং রবীন্দ্রনাথের গানের একটি বিশেষ ভঙ্গিও আছে। যে ভঙ্গিটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর আড়াই হাজার গানে বজায় রেখেছেন। নৃত্যনাট্যগুলির সংলাপ-অংশের সুরযোজনায়ও তা সম্পূর্ণ উপস্থিত। বিশেষ আশঙ্কা ছিল, এই স্টাইল 'চণ্ডালিকা'র হিন্দীরূপে কতখানি যথাযথ থাকবে। সুখের কথা, সঙ্গীত পরিচালক শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ হিন্দী 'চণ্ডালিকা'র বাণীতে মূল সুর কৃতিত্বের সঙ্গে আরোপ করেছেন। যতদূর জানি শ্রীঘোষ ভারতীয় ক্লাসিক সঙ্গীতেরই চর্চা করেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর আওতার বাইরে। তবু যে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সার্থকভাবে যোজনা করতে পেরেছেন, এতে তাঁর বহুমুখী সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল।

কয়েকটি জিনিষ খুব খারাপ লেগেছে। সঙ্গতে খোলের পরিবর্তে হিন্দী ফিল্মের ঢোল জাতীয় সস্তা বাজনা (এ, আই, আর লাইট মিউজিকে যা হামেশাই ব্যবহৃত হয়) কেন দেওয়া হল তার কোন কারণ বোঝা গেল না। রেডিওর সাঙ্গীতিক শ্রেণী-বিভাগে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'লঘুসঙ্গীতে'র পর্যায়ে ফেলা হয়েছে বলে? রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্যে খোলের ব্যবহারই বিধেয়, একথা কী সঙ্গীত পরিচালক জানেন না? কারণ যা-ই হক, এর ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেকখানি মাধুর্য নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাছাড়া মা ও প্রকৃতির গানের মাঝে ক্ষণিক বিরতি নাট্যরসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। মনে রাখা উচিত ছিল যে, এখানে গানগুলি পাত্রপাত্রীর সংলাপ। সুতরাং কথোপকথনের মাঝে কালক্ষেপ অস্বাভাবিক।

'এখনো জাগেনি' গানটির ছন্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। মূল 'চণ্ডালিকা'য় যে ছন্দ আছে তার তুলনায় নিকৃষ্ট লেগেছে এমন কথা বলা যায় না। তবে নেহাৎ প্রয়োজন না হলে ছন্দান্তর করে লাভ কী?

সেদিনের শিল্পিবৃন্দ সত্যিই গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। মা এবং প্রকৃতির ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে সুপ্রীতি ঘোষ ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের দরদভরা কণ্ঠে সেদিন উল্লিখিত চরিত্র দুটির ভাবনা-বেদনা সুন্দরভাবে ফুটেছে।

বাণী দত্ত

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

আধুনিক কবির সম্মান লাভ

গত কয়েক বছর ধরে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা কবিকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এদেশে সাহিত্য পুরস্কারের তেমন চল নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দু-একটি স্মৃতি-পুরস্কার দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিসীমা বড় সংকীর্ণ। তাঁরা বাঁধাপথের বাইরে পা ফেলতে একেবারেই নারাজ। এই পুরস্কার সম্পর্কে তাই পাঠকসমাজে যেমন বিশেষ কোন কৌতূহল নেই, তেমনি লেখকরাও খুব আগ্রহী নন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। উক্ত রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেশের মধ্যে কিছুটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এও লক্ষ্য করেছি অনেক লেখকই রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তির আশা মনে মনে লালন করেন।

এ-পর্যন্ত কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়নি। সুতরাং নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন তাঁদের বাৎসরিক অধিবেশনের সময় যে কবি-সম্বর্ধনার আয়োজন করেন তা অভিনব এবং একক। এ-যুগে সাধারণভাবে কবিতার পাঠক সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, উপরন্তু বিশেষ বিশেষ মহল থেকে সচরাচর যাকে 'আধুনিক কবিতা' বলা হয় তার বিরুদ্ধে প্রচারের অন্ত নেই। এই প্রচারে সাধারণ পাঠকরা প্রায়ই বিভ্রান্ত হন। একথা নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবেন না যে, যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্যানধারণা, সমাজভাবনা বদলায়। এই পরিবর্তিত যুগের স্বাক্ষর 'আধুনিক কবিতা'য় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাব্যের আঙ্গিকও অনেক বদলেছে। আজ আমরা নিঃসন্দেহে জেনেছি যে, কোনরকমে অন্ত্যানুপ্রাস বজায় রেখে ছন্দ মেলাতে পারলেই কবিতা লেখা যায় না।

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের বিচারের তেরশো বাষট্টি সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচিত হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর "পালা-বদল"। প্রতিবছর সম্মেলনের শেষ দিনের অনুষ্ঠানে কবি-সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। অমিয়বাবু কয়েক বছর যাবৎ বিদেশে রয়েছেন। তাই বুদ্ধদেব বসু তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং তা অমিয়বাবুর কাছে পাঠাবার দায়িত্বও। ইতিপূর্বে এই সম্মান লাভ করেছেন যথাক্রমে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। দেখা যাচ্ছে, 'আধুনিক কবি' রূপে চিহ্নিত কবিদেরই সম্মেলন পুরস্কৃত করছেন। এতে একথাই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত যে, সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার বিরোধী।

'পালা-বদলে' প্রবাসী কবির দেশের প্রতি ভালবাসাই বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ঘরে ফেরা বাঁশীর ডাক তিনি বার বার উৎকর্ণ হয়ে শুনেছেন। বাংলা দেশের ঘরকন্নার উজ্জ্বল চিত্র এখানে উপস্থিত। দেশান্তরে থেকেও দেশের প্রশান্ত সমাহিত জীবনের কথা এমন অনায়াসে কবি বলেছেন যে সত্যি অবাক লাগে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'চিরন্তন বাংলা দেশকে'।

সিদ্ধার্থ সেন

গ্রন্থপরিচয়

সেই কন্যাকে : সুকুমার রায়। জিজ্ঞাসা। এক টাকা।

শাল-মহুয়ার দিন : বেণু দত্তরায়। মধুমিতা। আট আনা।

এক ফালি ঘাস : সুধীর সেন। করিমগঞ্জ আলোক সঙ্ঘ। এক টাকা।

বাংলা দেশে আজকাল কাব্যচর্চা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে যেমন কবির সংখ্যা অগণ্য এবং অসংখ্য নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রতি মাসে প্রকাশিত হচ্ছে, আর একদিকে তেমনি সাধারণ পাঠকের মধ্যেও কবিতা সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থের বিক্রীর সংখ্যা ছিল একান্তই সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি এ-অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজকাল কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ আমাদের কাছে একেবারে বিস্ময়কর ঠেকছে না।

বাংলা কবিতার পক্ষে এটি সুলক্ষণ যে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে পাঠকসাধারণের মধ্যে যে বিরূপতার ভাব ছিল তা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। আধুনিক কাব্যপাঠে অভ্যস্ত নন এমন পাঠকও আধুনিক কবিতা পড়ছেন। 'তুমি'র সঙ্গে 'চুমি' 'মনে'র 'বনে' ইত্যাদি মিল দিয়ে কবিতা লেখা আজকাল প্রায় উঠেই গেছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যধারাকেই তরুণ কবিরা অনুসরণ করছেন। তবে এঁদের কবিতায় তিরিশের যুগের কবিদের কণ্ঠস্বর বড় বেশী সোচ্চারিত।

সুকুমার রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বগত'য় নগরজীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুরই ছিল প্রধান এবং সে-কারণেই সম্ভবতঃ সমর সেনের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সমালোচ্য 'সেই কন্যাকে' সঙ্কলনও এর ব্যতিক্রম নয়। এই গ্রন্থের 'নাগরালি' কবিতায় নগরজীবনের প্রতি বিদ্রূপের মনোভাব ফুটেছে। তবে এই গ্রন্থে অন্য সুরও অশ্রুত নয়। কয়েকটি প্রেমের কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। যেমন :

তোমার বুকের মোমরঙা ফুল
ঢেকে দাও, যদি চাও,
কৃষ্ণ চুলের
অন্ধ প্লাবনে ;

তোমার ঠোঁটের তড়িৎ আকুল
মুছে দাও, যদি চাও
সুচারু নয়নে ;

তবু তো তোমার বকুল মালাটি ঘিরে
পিছে ফেলে আসি আমার হৃদয়খানি—
যে ভীরু পাখিটি আঁধার অলক চিরে
খুঁজে নেবে ঠিক মোমরঙা ফুলখানি ॥

বেণু দত্তরায় নির্ভেজাল প্রকৃতির কবি। 'শাল-মহুয়ার বনে' এক বিচিত্র জগত তার রূপ-রস-গন্ধ সমেত আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এখানে মানবজীবন অদৃশ্য—খালি পাহাড় আর অরণ্য, অরণ্য আর পাহাড়। কবি পুরোপুরি রোমান্টিক। মনে হয়, জীবনের আঘাত-সংঘাতে এই রোমান্টিক স্বপ্ন কিছু পরিমাণে ফিকে হতে পারে।

'এক ফালি ঘাসে'র অধিকাংশ কবিতাই কবি সুধীর সেনের অনুশীলন পর্যায়ের রচনা। অপরিণত চিন্তা এবং অপটু প্রকাশভঙ্গির ছাপ বড় স্পষ্ট। কয়েকটি কবিতা মাত্র উল্লেখ করার মত এবং সেগুলি গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে। কবি অবশ্য বলেই দিয়েছেন, 'অধিকাংশ কবিতাই প্রথম যৌবনের—আঠারো থেকে আঠাশ বছর বয়েসে রচিত, মাঝখানে দীর্ঘ সময়ের বন্ধ্যা বালুচর পেরিয়ে কয়েকটি মাত্র নতুন সংযোজনা।' আর এই শেষোক্ত কবিতা পাঠেই কবির রচনা সম্পর্কে মনে আশা জাগে।

হীরেন বসু

বৌদ্ধ দর্শন : রণজিৎকুমার সেন। শ্রীমা প্রকাশনী। দেড় টাকা।

সুপরিচিত লেখক শ্রীরণজিৎকুমার সেন-এর 'বৌদ্ধ দর্শন' গ্রন্থটি বাংলার বৌদ্ধ-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। বইটি বৌদ্ধ-পরিনির্বাণ-জয়ন্তীর প্রাক্কালে প্রকাশিত হলেও এর আবেদন শুধুমাত্র ওই উপলক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—যেমন এই জাতীয় কোন-কোন বইয়ের বেলায় ঘটতে দেখা গেছে। বইয়ের আবেদন উপলক্ষ-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ সকল সময়ের জন্যই বইটি পাঠযোগ্য হয়ে থাকবে। রণজিৎবাবু তাঁর 'বৌদ্ধ দর্শন' গ্রন্থে বৌদ্ধ দর্শনের মূল নীতিগুলি যেমন সংকলিত করেছেন তেমনি বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের ইতিহাসের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও সেই সঙ্গে আলোচনায় সংযোজিত করেছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান সংবাদ বইটিতে পাওয়া যাবে। বাংলায় এ যাবৎ যে যে বৌদ্ধ ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার একটি তালিকা গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এতে অনুসন্ধানী পাঠকের উপকার হবে।

কিন্তু এ বইয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল ভগবান বুদ্ধের একাধিক প্রসিদ্ধ উক্তি ও তার তর্জ্জমার সমাবেশ। বাংলা দেশের সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকলেও গৌতম বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত যে সকল বাণী হতে ওই তত্ত্বসমূহের উদ্ভব, তার সঙ্গে তেমন পরিচিত নন। এই গ্রন্থে এইরূপ অনেকগুলি মূল্যবান বাণী সংকলিত হয়েছে। রণজিৎবাবু সুসাহিত্যিক ও চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক, বাণীগুলির বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায় তিনি তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাক্ষমতা পুরাপুরি মাত্রায়ই প্রয়োগ করেছেন দেখা গেল।

মোটের উপর 'বৌদ্ধ দর্শন' একটি সুলিখিত চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ। সাম্প্রতিক কালের গল্প-উপন্যাস-লঘুরচনার ডামাডোল আর ভিড়ের মধ্যে চিন্তা-উদ্রেককারী রচনা বড় কেউ একটা পড়তে চান না। সেটা আধুনিক পাঠক সম্প্রদায়ের একটা মস্ত দৈন্য বলতে হবে। 'বৌদ্ধ দর্শন' জাতীয় গ্রন্থপাঠে এই দৈন্য দূর হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই ওই সদ্‌গ্রন্থের পোষকতা করা সকলের উচিত।

নারায়ণ চৌধুরী

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ২, ন্যায়রত্ন লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।